REG. No. C. 589

হিন্দুস্থান সমবায়-বীমা-মণ্ডলী—যাঁহারা এই সুবৃহৎ স্বদেশী অনুষ্ঠানের আশ্চর্য্য অভ্যুদয়, অপ্রতিহত ক্রমোন্নতি ও বিস্তার সম্বন্ধে অবগত হইয়া ইহার সহিত অংশী, বীমাকারী বা সংগ্রাহকরূপে যোগদান করিয়া লাভবান্ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

কর্পোরেশন ষ্ট্রীট ; কলিকাতা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রধান সম্পাদক

৩৩শ ভাগ] বৈশাখ ; ১৩৩০ সাল। [১ম সংখ্যা।

৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রতিষ্ঠিত—

সাহিত্য

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত

লেখকগণের নাম।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিশেখর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম-এ, শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনিমচাঁদ এম-এ, বি-এল, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহারাধন বক্সী।

সূচী।

১।	তন্ত্র বিজ্ঞান	১	৭।	প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীত	৪৪
২।	উষা	১২	৮।	বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী	৫২
৩।	শক্তি	১৬	৯।	সন্দেহ ভঞ্জন	৫৮
৪।	বাঙ্গালী কবির স্বদেশপ্রেম	১৭	১০।	নব বর্ষে	৬৮
৫।	সোণামুখী ছুঁচ	২৬	১১।	জাতীয় অভ্যুত্থান	৭০
৬।	'হাঁ' ও 'না'	৩০			

জারমলীন জ্বরের যম !

আর, গেভিন কোং—কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাদুর
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, ভরতপুর,
পাতিয়ালা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্যান্য স্বাধীন
রাজন্যবর্গের অনুমোদিত বিশ্বস্ত পৃষ্ঠপোষিত
কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

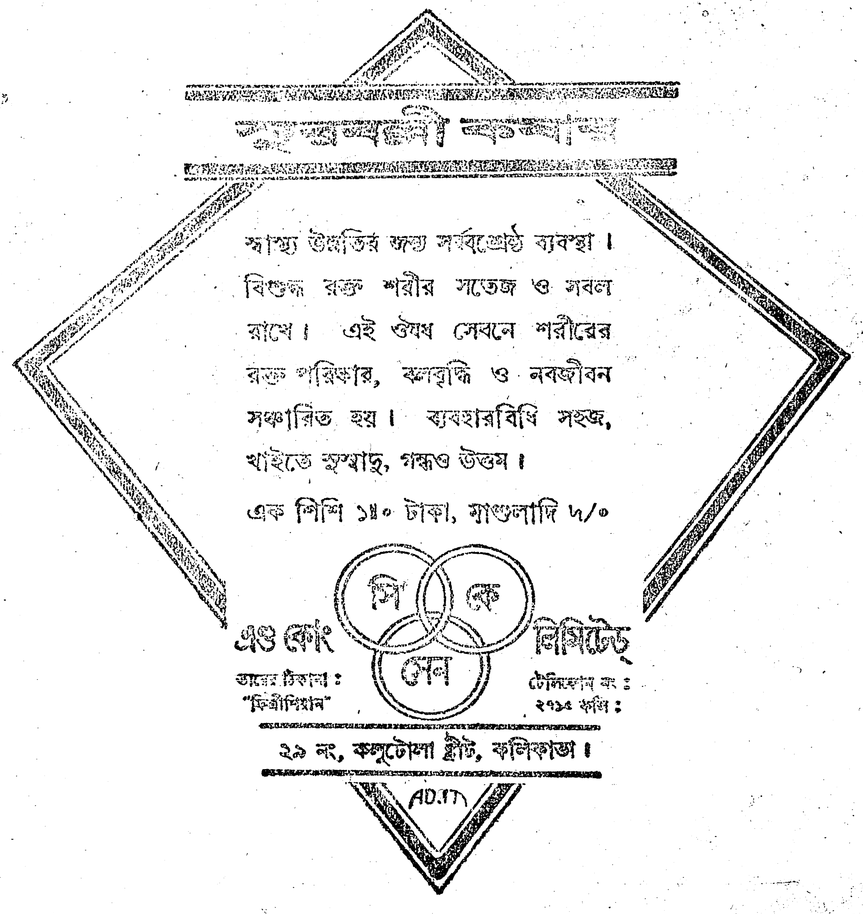

আপনাদের চির-আদরের,
চির-পুরাতন

বেঙ্গল সোপ

আবার নূতন বেশে
আপনাদের নিকট উপস্থিত।

এ, ঘোষ—ম্যানেজার
১১ নং পাইকপাড়া রোড,
কালকাতা।

খুব ঘন কালো কেশের গোছা
কিসে হয়??

সুরমা * * সুরমা * * সুরমা * * সুরমা	নিত্য "সুরমা" ব্যবহার করুন। গুণে, গন্ধে সৌন্দর্য্যে "সুরমা" বঙ্গ ললনার চির আদরের জিনিস। সুরমায় চুল ঘন হয়, কুচকুচে কাল হয়, মাথায় মরামাস জন্মায় না। অথচ দামে খুব সস্তা। মূল্য প্রতি শিশি বার আনা। ডাক মাশুল এগার আনা মাত্র।	সুরমা * * সুরমা * * সুরমা * * সুরমা

এস, পি, সেনের খুব ভাল
একটী সুগন্ধি
বা
এসেন্স।

"মিল্ক অব্ রোজ"
বা
গোলাপ সুষমা।

আজই ব্যবহার করুন। রুমালে দুই চারি ফোঁটা দিলে, সপ্তকোটা বস্রাই গোলাপের সুগন্ধ পাবেন। নিজে সে সুগন্ধে বিভোর হবেন, আর যাদের কাছে যাবেন তাঁরাও বলবেন "বা'! 'কি সুন্দর এসেন্স মেখেছেন?"

কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়—১৯।২ লোয়ার চিৎপুর রোড।
কলিকাতা।

বাঙ্গলার চির-সৌন্দর্য্যময়ী

মহিলাকুলের শ্রেষ্ঠ অঙ্গরাগ

কে-শ-র-ঞ্জ-ন তৈ-ল।

মাথায় মাখলে দিনরাত সমানভাবে সুগন্ধ থাকে। নিত্য মাখিলে চুল হাল্‌কা ও মিশকালো হয়। রাত্রে অনিদ্রা হ'লে, কেশরঞ্জন মাখলে, সেটা দূরে যায়। পরীক্ষার সময় বা সাংসারিক কাজে যখন মস্তিষ্ককে খুব চালনা কর্ত্তে হয়, তখন "কেশরঞ্জন" মাখলে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকে। নারীর কেশ-প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ উপাদান, গুণে গন্ধে পবিত্রতায় চির আনন্দদায়িনী, তৃপ্তিবিধায়িনী মদিরবাসে ভরপুর।

কেশরঞ্জন তৈল।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডাকব্যয় ।৶৹ আনা।

দুইটী খুব ভাল ভাল ঔষধ

১। অশোকারিষ্ট।

সকল রকম স্ত্রী ব্যাধিতে অতি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। আমরা পঞ্চাশ বৎসরের পরীক্ষায় এটা খুব ভালই রকমেই জানতে পেরেছি। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা। ডাকব্যয় ॥৶৹ আনা।

২ পঞ্চতিক্ত কষায়।

স্বাস্থ্যবিভাগের রাজকর্ম্মচারীরা প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছেন ম্যালেরিয়া কিসে যায়। ম্যালেরিয়া দেশের মহাশত্রু। সোনার বাংলা দিনে দিনে জনশূন্য হচ্ছে। যদি নির্দ্দোষভাবে ম্যালেরিয়ায় আত্মরক্ষা কর্ত্তে চান, তা হ'লে আজ থেকে আমাদের "পঞ্চতিক্ত কষায়" রোগীকে সেবন কর্ত্তে দিন। ফল অতি বিস্ময়কর। মূল্য এক টাকা। ডাকব্য[illegible] ।না।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটীবাজার, কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেনগুপ্ত।

অশোকারিষ্ট।

এই অরিষ্টের গুণ যে কি অসাধারণ তাহা সর্ব্বত্র সুপরিচিত, স্ত্রীলোকের রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ; অর্থাৎ ঋতুকালে, যন্ত্রণার সহিত অল্প অল্প রজঃস্রাব এই সকল রোগের উপদ্রব ইহার দ্বারা অচিরাৎ প্রশমিত হইয়া যায়।

জরায়ু যন্ত্রের বিকৃতিবশে স্ত্রীলোকেরা উক্ত রোগাবস্থায় উপনীত হইলে প্রসঙ্গত যদি জ্বর, অম্ল, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, বা অনিদ্রা, প্রভৃতি কোন উপদ্রব উপস্থিত হয়, তবে তৎসমস্তও এই অরিষ্ট সেবনে সত্বর নষ্ট হইয়া যায়। জরায়ুর দোষ নাশ করিয়া তাহার বীজ গ্রহণে শক্তি বর্দ্ধিত করিবার পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ।

এতদ্ব্যতীত রক্তার্শ ও রক্তপিত্ত রোগেও এই ঔষধ আশ্চর্য্য শুভ ফলপ্রদ।

মূল্য—৮ আঃ শিশি ১৲ টাকা। ২৪ আঃ বোতল ২॥৹ আড়াই টাকা

রোহিতকারিষ্ট।

[প্লীহা ও যকৃত রোগের সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ।]

ইহা সেবনে অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহাও অচিরাৎ প্রশমিত হয় এবং প্লীহা বৃদ্ধি ও যকৃৎ দুষ্টি হেতু আনুষঙ্গিক জ্বর, অরুচি, শোথ, রক্তাল্পতা, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব আশু নিবারিত হয়।

এই অরিষ্টের অসাধারণ গুণ এই যে, দুর্ব্বার অর্শ, গুল্ম ও উদররোগে ইহা আশাতিরিক্ত ফলপ্রদ। প্লীহার অতিবৃদ্ধি জন্য উদররোগে ইহা অব্যর্থ। বহু দিনের জীর্ণ জ্বরে ও যকৃৎ প্লীহায় যাহাদের দেহ জীর্ণ শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য এবং নিত্য জ্বরের আক্রমণে জীবনে যাহারা আতঙ্কগ্রস্ত, এ অরিষ্ট তাহাদের সর্ব্বাতঙ্কনাশে সমর্থ।

মূল্য—আট আউন্স শিশি ১৲ এ[illegible] আউন্স বোতল ২॥৹ আড়াই টাকা। ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

৫৪ ও ৫২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিক[illegible]।

শারিবাদ্যাসব।

(প্রমেহ বা বহুমূত্র জন্য পীড়কা, (কার্ব্বঙ্কল) এবং ক্ষত, রক্তদুষ্টি ও ব্রণাদি রোগের অমোঘ ঔষধ)।

প্রমেহ বা বহুমূত্র হইতে যে পীড়কা (কার্ব্বঙ্কল) রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা বড়ই ভীষণ এবং বিপজ্জনক। ইহার যে কি অসহ যন্ত্রণা, তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এ রোগের ভীষণ আক্রমণ হইতে অল্প লোকই আত্মরক্ষা করিতে পারেন।

ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রে এ রোগের যে অপূর্ব্ব চিকিৎসা-প্রণালী উদ্ভাবিত আছে, নিশ্চয় বলিতে পারি আধুনিক জগতের কোন সভ্য দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রই সেরূপ প্রণালী উদ্ভাবিত করিতে পারে নাই।

অস্ত্রোপচারে "কার্ব্বঙ্কল" রোগের পরিণতি প্রায়ই ভীষণ হইয়া উঠে। আমরা খুব সাহস করিয়াই বলিতে পারি, এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের সনাতন অরিষ্ট আসবই পরম উপকারী। এই শারিবাদ্যাসব দুষ্টক্ষত, ও রক্তদুষ্ট রোগের অমোঘ ঔষধ। ইহাতে সর্ব্ববিধ ক্ষত, ফোঁড়া ও পারদবিকৃতি অল্প কালেই আরোগ্য হয়। দেহে কান্তি পুষ্টি ও বলবীর্য্য আনয়ন করে। ইহা সালসার ন্যায় কার্য্য করিয়া দেহ নূতনভাবে গঠিত করে।

মূল্য—আট আউন্স শিশি ১॥০ টাকা। চব্বিশ আউন্স বোতল ৪৲ চারি টাকা। ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

বৈদ্যনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভৈষজ্যালয়।

৫৬ ও ৬২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যের' উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

বিপিনচন্দ্রের নূতন পুস্তিকা

আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ।

তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলেই পাইবেন

কুড়ি খানা লইলে ভিঃ পিঃতে তিন টাকা।

পাল ব্রাদার্স।

৫৫। বি শাখারীপাড়া রোড় ভবানীপুর কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোম্পানী

হোমিওপাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড ও ব্রাঞ্চ ৪৫ ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট

সাধারণ ঔষধের মূল্য—অরিষ্ট ।৵০ প্রতি ড্রাম, ১ হইতে ১২ ক্রম ।০ প্রতি ড্রাম, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ।৵০ প্রতি ড্রাম, ২০০ ক্রম ১৲ প্রতি ড্রাম।

সরল গৃহচিকিৎসা

গৃহস্থ ও ভ্রমণকারীর উপযোগী, কাপড়ে বাধান [illegible] টাকা মাত্র, মাশুল ৵১০।

ইনফ্যানটাইল লিভার

ডাঃ ডি, এন, রায়, এম্, ডি, কৃত ইংরেজি পুস্তক, ১৮১ পৃঃ, কাপড়ে বাঁধান মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে অনুগৃহীত হইব।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আশ্চর্য্য ফলে জগৎ মুগ্ধ, কিন্তু সেই হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হইয়া চিকিৎসককে চিকিৎসা ব্যবসায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে ও অনর্থক রোগীকে কষ্ট পাইতে, এমন কি অকালমৃত্যু ঘটিতেও দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ অবিশুদ্ধ ও কৃত্রিম সস্তার ঔষধ। পীড়া কঠিন অবস্থায় ঔষধের পরীক্ষা, সেই পরীক্ষায় আমাদিগের ঔষধ চিরকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবং ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা পাইয়া আসিতেছে। আমরা অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করি। আমাদিগের ঔষধের মূল্যের সাধারণ হার:—

মাদার টিংচার বা মূল আরক—১ ড্রাম ।৵০ দুই ড্রাম ৷৷৵০ ; ক্রুড্ বা মূল চূর্ণ—১ ড্রাম ৵০, দুই ড্রাম ১।০, ১ হইতে ১২ ক্রম বা ডাইলিউসন—১ ড্রাম। ২ ড্রাম ।৵০ ; তদূর্দ্ধ ৩০-ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।৵০. ২ ড্রাম ৷৷০ ; তদূর্দ্ধ ১০০ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ৷৷০, ২ ড্রাম ৵০ ; তদূর্দ্ধ ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৵০, ২ ড্রাম ১।০ ; তদূর্দ্ধ ৫০০ ক্রম অর্দ্ধ ড্রাম ৷৷৵০, ১ ড্রাম ১।০, দুই ড্রাম ২৲ ; তদূর্দ্ধ ১০০০ অর্দ্ধ ড্রাম ১।০, ১ ড্রাম ২।০ ; ২ ড্রাম ৪৲ ; C. M. : অর্দ্ধ ড্রাম ২৲ ; ১ ড্রাম ৪৲ ২ ড্রাম ৬৲। ১X হইতে ৬X বিচূর্ণ ১ ড্রাম ৷৷০ ; দুই ড্রাম ৵০ ; ১২X পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ৵০ ; ২ ড্রাম ১।০। ইহা ভিন্ন অনেক মূল্যবান্ ঔষধ আছে; তাহার মূল্য ও নিম্নক্রমের মূল্য পৃথক হারে লওয়া হয়। এককালীন নগদ ১০৲ টাকার ঔষধ লইলে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। ঔষধ-ব্যবসায়ীরা, যাঁহারা অধিক টাকার ঔষধ লইবেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে কমিশন দেওয়া হয়। এসিডাদির জন্য কাঁচের ছিপিযুক্ত বা গাটা-পার্চা শিশি আবশ্যক হইলে তাহার পৃথক্ মূল্য লওয়া হয়। হোমিওপ্যাথিক পুস্তক, শিশি, কর্ক, সুগার অব্ মিল্ক, গ্লবিউল, পিলিউল, ছুরী, কাঁচি ইত্যাদি যন্ত্র, ষ্টেথোসকোপ, থার্ম্মমিটার হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জ, চশমা—সকল দ্রব্য যথামূল্যে বিক্রয় হয়।

পত্র পাইলে বিনামূল্যে মূল্যনিরূপণ পুস্তক পাঠান হয়।

লাহিড়ী এণ্ড কোং।

প্রধান ঔষধালয়:—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে বাধিত হইব।

৭৩০/২

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সাহিত্য, ৩৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা সন ১৩৩০।

তন্ত্র-বিজ্ঞান।

(১)

বর্ত্তমান সময়ে তন্ত্রবিষয়ক প্রবন্ধাদিরচনার অভাব নাই ; তাহাতে লেখক-দিগের তন্ত্রগবেষণার ও পাঠকদিগের তন্ত্রার্থজিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায় ; সুতরাং এই সময়ে তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপতঃ প্রকাশিত করিতে পারিলে অনুসন্ধিৎসুর অনুসন্ধানের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইবে মনে করিয়া আমরা মোটামুটি তন্ত্রের বিবরণ এবং প্রদর্শনীয় বিপ্রতিপত্তির যথাসাধ্য সমাধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রবন্ধাদি রচনার দ্বারা তন্ত্রের রহস্যোদ্ঘাটন বর্ত্তমান সময় সাহিত্যসেবার একটা অঙ্গ হইয়া পড়িলেও এতদ্দ্বারা প্রকৃত রহস্যোদ্ঘাটন সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। যেহেতু তন্ত্রশাস্ত্র রহস্যশাস্ত্র এবং সঙ্কেতবিদ্যা ; তন্ত্র স্বয়ং বলিতেছেন—"সঙ্কেত-বিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা।" উপযুক্ত গুরু ও উপযুক্ত শিষ্য ভিন্ন এই বিদ্যার প্রকৃত রহস্যোদ্ঘাটন হইতে পারে না। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোকের দ্বারা তন্ত্র-শাস্ত্রের আলোচনা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক শ্রেণী শাস্ত্রার্থের প্রতি আস্থা-বান্, তাঁহারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে এবং শাস্ত্রার্থব্যাখ্যার দ্বারা সমাজের হিতসাধন করিতে প্রয়াসী। এই শ্রেণীর লোক গুরুপরম্পরায় যাহা শিখিতে পারিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এই অসামর্থ্যের মূল গুরূপদেশ, কারণ গুরু শিক্ষা দিবার সময়েই প্রতিজ্ঞা করাইয়া দেন যে—"সাবধান, উহা সাধারণের নিকট, বিশেষতঃ নাস্তিক পাষণ্ডের নিকট প্রকাশ করিও না"।* সুতরাং তাঁহাদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক রহস্যপূর্ণ স্থানগুলি চাপিয়া যাইতে হয়।

---

* তন্ত্রের অতি রহস্যপূর্ণ বিষয়গুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার পক্ষে নানা বিঘ্ন আছে। অবিশ্বাসী অথবা অল্পবিশ্বাসীর পক্ষে তাহা দ্বারা হিত না হইয়া অহিতই হইবার সম্ভাবনা। এইজন্যই রহস্যপূর্ণ স্থানগুলি গোপনে রাখিবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে "গোপয়েন্মাতৃজারবৎ" ইত্যাদি শপথ-বাক্য বিন্যস্ত হইয়াছে।

অপর এক শ্রেণীর শাস্ত্রানুশীলনপ্রয়াসী শাস্ত্রকে মনুষ্যবিরচিত বলিয়া বিশ্বাস; শাস্ত্রার্থের প্রতি তাঁহাদের আস্থা বা ভক্তি নাই। ইঁহারা পাণ্ডিত্য-খ্যাপনোপার্জ্জিত যশোলিপ্সায় শাস্ত্রচর্চ্চায় ব্যাপৃত হইয়া থাকেন। ইঁহারা নিজে না বুঝিয়াও পরকে বুঝাইয়া দিতে প্রয়াসী হন। দৈনন্দিন কর্ত্তব্য হিন্দু-চিত অনুষ্ঠানজ্ঞানে ইঁহারা নিতান্তই দরিদ্র। এই শ্রেণীর ভিতরে আবার দুইটা ভাগ আছে। কতকগুলি খাঁটি সাহেব, আর কতকগুলি বাবুনামধারী দেশী সাহেব। ইঁহাদের মধ্যে কাহারই গুরূপদেশ নাই—থাকিবার কারণ বা উপায়ও নাই। ইঁহাদের অবলম্বন ষ্টাডি (study), পক্ষান্তরে শাস্ত্রার্থবিশ্বাসীর অবলম্বন অধ্যয়ন এবং সাধনা। অধ্যয়ন ও ষ্টাডি (study) এই উভয়কে একার্থে গ্রহণ করিলে বড়ই ভুল হইবে। কারণ,—আমাদের অধ্যয়ন নিয়মপূর্ব্বক বিদ্যাগ্রহণ। গুরুকুলে বাস করিয়া যথাবিধি অধ্যয়ন করিতে হয়। প্রথমতঃ গুরুর নিকট বেদস্বীকার অনন্তর বেদার্থের তাৎপর্য্য-নির্ণয়াত্মক বিচার, অভ্যাস, জপ এবং শিষ্যকে বিদ্যাদান, বেদাভ্যাস এই পঞ্চাবয়বাত্মকরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।* কাজেই ইহা ষ্টাডি (study) হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। বলা বাহুল্য, বেদাভ্যাস উপলক্ষণমাত্র, সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই এই অবয়বপঞ্চক বিহিত হইয়াছে। দার্শনিক মহাকবি শ্রীহর্ষ চতুর্দ্দশবিদ্যারই চারিটি অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন।† উক্ত অবস্থাচতুষ্টয় অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ এবং প্রচারণ নামে অভিহিত হইয়াছে। এতন্মধ্যে শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের নাম আচরণ। আচরণ-ব্যতীত শাস্ত্রের প্রকৃতানুশীলন সম্পূর্ণ হইতে পারে না, এমন কি কর্ম্মাঙ্গোপকরণাদির স্বরূপোপলব্ধিই অনুষ্ঠানাদর্শীর পক্ষে অসম্ভব।

পৌরাণিক গল্পে গুরুকুলবাসী শিষ্যের গোচারণ-ব্যাপার এবং গুর্ব্বাশীর্ব্বাদে বিদ্যালাভ আজ পাশ্চাত্যশিক্ষাদৃপ্তের চক্ষে হাস্যাস্পদ ব্যাপাররূপে প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু সিদ্ধগুরুর কৃপায় মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বজ্ঞতালাভের উপায় তন্ত্রশাস্ত্রেই বিহিত হইয়াছে। গোচারণ প্রভৃতি ব্যাপারও উপহাসাস্পদ নহে, প্রত্যুত ইহার উদ্দেশ্য যে কত মহৎ তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অহিন্দুর পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। সেকালে শিষ্যগণ গুরুর নিকটে থাকিয়া যাগাদির অনুষ্ঠানপদ্ধতি শিক্ষা করি-

* বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারো হভ্যসনং জপঃ।
তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসোহি পঞ্চধা॥ (আহ্নিকতত্ত্বে দক্ষবচন)।

† অধীতিবোধাচরণ প্রচারণৈ র্দশাশ্চতস্রঃ প্রণয়ন্নুপাধিভিঃ।
চতুর্দ্দশত্বং কৃতবান্ কুতঃ স্বয়ং ন বেদ্মি বিদ্যাসু চতুর্দ্দশস্বয়ম্।' (নৈষধচরিত ১।৪)

তেন, আধুনিক শিক্ষানবিশের মত মুখস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সার্টিফিকেট্ সংগ্রহ করা তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁহারা শাস্ত্র পড়িতেন, শাস্ত্রার্থের অনুষ্ঠান শিক্ষা করিতেন, গুরুর অনুমোদিত পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতেন। গুরু যখন শিষ্যকে বিনীত, সহিষ্ণু এবং শাস্ত্রার্থে অভিজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন, তখনই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইত। সুতরাং ঈদৃশ শিষ্যের দ্বারা জগতের ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্টের সম্ভাবনা হইত না।

এই ত হইল বেদাদি শিক্ষার কথা; তান্ত্রিক শিক্ষা এতদপেক্ষায় অতীব কঠোরতর নিয়মসাধ্য। এমন কি এক সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা—অপর সম্প্রদায়ের জানিবার উপায় নাই। রহস্যগোপনই উহার মূলভিত্তি। তন্ত্র বলেন—

"বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবীবিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

ইহার অর্থ—বেদপুরাণাদিশাস্ত্র সর্ব্বভোগ্যা বেশ্যার মত, ইহাতে সাধারণের অধিকার আছে; কিন্তু এই শৈববিদ্যা কুলবধূর মত গোপনীয়া। পরমার্থতঃ উপদেশ ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম্মাবধারণ একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং ইতিহাস-ঘটনপটীয়ান্ বাক্‌সর্ব্বস্ব শাস্ত্রার্থজ্ঞানবিধুর পাণ্ডিত্যখ্যাপনলোলুপ মানবের উপদেশাবলীর মূল্য যে কত তাহা মনীষিগণই বিচার করিবেন।

তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় অতীব বিস্তৃত এবং রহস্যপূর্ণ। সাঙ্গ চতুর্ব্বেদের বিস্তারাপেক্ষাও ইহার অধিকতর বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তন্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলি বিপ্রতিপত্তি আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বিপ্রতিপত্তি পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং তন্ত্রবিশ্বাসীদের মধ্যেও অনেকের মনে স্থান লাভ করিতেছে। অপর কতকগুলি বিপ্রতিপত্তি পাশ্চাত্য ও দেশীয় ঐতিহাসিকগণের আলোচনায় বর্ত্তমান সময়ে উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা এইগুলি ক্রমনিবদ্ধ করিয়া পরে তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিব।

(১) তন্ত্রসম্বন্ধে অনেকের ধারণা—বঙ্গদেশেই তন্ত্রের প্রভাব, অন্যত্র ইহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

(২) অনেকে এইরূপ বিশ্বাস করেন—তন্ত্রমাত্রেই শক্তির উপাসনা এবং পঞ্চতত্ত্বের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই শাস্ত্র অশ্লীলতাপূর্ণ এবং বেদবিরুদ্ধ, অতএব বেদমার্গানুসারীদিগের উপেক্ষণীয়। উহা বেদভ্রষ্টদিগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।

(৩) অনেকের বিশ্বাস—তন্ত্রের সংখ্যা চতুঃষষ্টি এবং প্রত্যেক তন্ত্রেই চতুঃষষ্টি-সংখ্যক পটল ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহা সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং যেসকল তন্ত্রের দশ পাঁচ বা সাত পটল মাত্র দৃষ্ট হয়, সেইগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(৪) কতিপয় পাশ্চাত্য মনীষীর মতে—তন্ত্রশাস্ত্র নিতান্ত আধুনিক এবং মহাযানি বৌদ্ধদিগের আবিষ্কৃত তন্ত্রই বর্ত্তমান হিন্দুতন্ত্রের মূল।

তন্ত্র কি এবং তাহার মূল কোথায় প্রথমতঃ এই বিষয়েরই আলোচনা করা কর্ত্তব্য; কারণ—ইহা হইতেই প্রদর্শিত বিপ্রতিপত্তিগুলির অধিকাংশেরই সমাধান হইতে পারে।

তন্ত্রশব্দ শাস্ত্রসামান্যবাচী হইলেও উপাসনাপ্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষই তন্ত্রনামে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দের মতে মানবজাতির জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেদ-প্রভৃতি শাস্ত্রনিচয় বিশিষ্টমানবগণকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে; সুতরাং ইঁহাদের মতে নানারূপ যুক্তিতর্কের সাহায্যে সকল শাস্ত্রেরই একটা না একটা রচনাকালও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতীয় মনীষিগণ বেদকে অপৌরুষেয়রূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে ইহা নিত্য, প্রলয়ের পর ব্রহ্মার মুখ হইতে উহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র। ঋষিগণ মন্ত্রের দ্রষ্টা, কর্ত্তা নহেন। সুতরাং ইহার আদিকাল নাই। বেদের অপর নাম শ্রুতি, কারণ উহা লোকপরম্পরায় শুনা যাইতেছে মাত্র, উহার নির্ম্মাণ বা উৎপত্তি কেহ কখনও দেখেন নাই। বেদান্তদর্শনে ভগবান ব্যাস পরমেশ্বরকেই সমস্ত শাস্ত্রের যোনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্ত্রও যখন শাস্ত্র, সুতরাং পরমেশ্বরই তন্ত্রের যোনি বা উৎপত্তিস্থান বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র মহামতি ভাস্কর রায় ও শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মহেশ্বর হইতেই সর্ব্বশাস্ত্রের উৎপত্তি স্থিরীকৃত করিয়াছেন। তিনি তন্ত্রকে বেদস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তন্ত্র উপনিষদেরই শেষ বা অঙ্গ; অর্থাৎ উপনিষদে দেবতার যে একত্ব বহুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যে বহুলীভাব এক দেবতারই মহিমা বা বিভূতিরূপে বিবেচিত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রে সেই বিষয়ই অতিবিস্তৃতভাবে বর্ণিত দেখা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহামতি কুল্লুকভট্ট মন্বর্থমুক্তাবলীতে তান্ত্রিক ও বৈদিক এই দুইপ্রকার শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য "কালমাধব" গ্রন্থে সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রকে "আগম" ও "শৈবাগম" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে"র

উপক্রমস্থ তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যানেও তিনি তন্ত্রশাস্ত্রকে "শৈবাগম" নামেই উল্লিখিত করিয়াছেন। ইঁহার মতে বেদ ও তন্ত্র এতদুভয়ের তুল্যতাই বিবেচিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য তন্ত্রের প্রতি অতীব ভক্তিমান্ ছিলেন। এমন কি তিনি "কালমাধব" গ্রন্থে কাণাদদর্শনাপেক্ষা তান্ত্রিক দর্শনের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" এবং "জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে"ও তিনি তন্ত্রের মত বিবৃত করিয়াছেন।

শঙ্করাবতার ভাগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তন্ত্রপথের অগ্রণী ছিলেন। এমন কি তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদ স্বামীরও তন্ত্রসরণিসঞ্চরণ পাটবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাস্কররায়-কৃত "সৌভাগ্যভাস্কর" নামক গ্রন্থে পদে পদে গৌড়পাদকৃত তান্ত্রিক সূত্র ও উক্ত সূত্রের ভাষ্য পরিগৃহীত হইয়াছে। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর উপাসক ছিলেন। তৎকৃত "আনন্দলহরী" এবং "সৌন্দর্য্যলহরী" নামক স্তোত্রদ্বয় ঐ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরিকৃত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থেও শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত শ্রীবিদ্যার স্তব নিবদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য তিনি তারা প্রভৃতি অনেক দেবতারই স্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার দেবতাবিভূতি-বিশ্বাসমূলক অভেদদৃষ্টিরই নিদর্শন। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠাপিত সুপ্রসিদ্ধ মঠচতুষ্টয়ে অদ্যাপি শ্রীচক্র পূজিত হইয়া থাকেন। গৌড়পাদকৃত তান্ত্রিকগ্রন্থেও ত্রিপুরাদেবীরই বিশেষ বিবরণ দেখা যায়। শঙ্করাচার্য্যের প্রপঞ্চসার গ্রন্থ তন্ত্র নিবন্ধের মুকুটায়মান বলিয়া উল্লেখযোগ্য। ভগবৎপাদের প্রধানতম শিষ্য সুগৃহীতনামা পদ্মপাদাচার্য্য প্রপঞ্চসারের টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টীকা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। পদ্মপাদাচার্য্য তান্ত্রিকসম্প্রদায়ের নিকট অতীব সুপরিচিত। তন্ত্রসম্বন্ধে তৎকর্ত্তৃক নিবন্ধান্তরও রচিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ রাঘবভট্টের গ্রন্থে পদ্মপাদের রচনাবলী সংশয়াপনোদক হেতুরূপে উপন্যস্ত হইয়াছে।

ইহাতে আপাততঃ একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, শঙ্করাচার্য্য তন্ত্রমতের পোষক হইলে তিনি সাজ্ঞ মত খণ্ডন করিয়াছিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বেদবাহ্য কৌলমতের ভিত্তিস্বরূপ শিবনিরপেক্ষ শক্তিকারণবাদ খণ্ডনই তাঁহার অভিপ্রেত, তৎকর্ত্তৃক শক্তির উপাসনা-প্রতিষেধ একেবারেই অসম্ভব। কারণ,—তাঁহার নিকট যে সকল শিষ্য সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আসিত, তিনি তাঁহাদের মধ্যে যাহাদিগকে প্রব্রজ্যার অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদিগকেই সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, পক্ষান্তরে বিষয়াসক্তি-

কষায়িতচিত্ত ক্ষুদ্রাধিকারীকে পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেন *। ঈদৃশ ক্ষুদ্রাধিকারীর জন্যই ক্রমমুক্তির উপায়স্বরূপ দেবতোপাসনার পথপ্রদর্শক প্রপঞ্চসার প্রভৃতি গ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এমন কি শিষ্যসহ তাঁহার দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে তৎকর্ত্তৃক শিবপূজনেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্ব্বশাস্ত্রে নিবন্ধাদিরচয়িতা প্রথিতযশা ভোজরাজ সমস্ত তন্ত্রের সারভূত অর্থ আর্য্যাচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তদীয় নিবন্ধের কিয়দংশ মাধবাচার্য্যের "কালমাধব" নামক স্মৃতিনিবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার রচনাবলী আমরা তান্ত্রিক দর্শনভাগে নিবদ্ধ করিয়াছি।

এই সকল কারণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়,—অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের গোড়া হইতেই তান্ত্রিক শক্ত্যুপাসনা চলিয়া আসিতেছে এবং বেদান্ত ও তন্ত্র এক প্রস্থানেই সম্বদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং তন্ত্র বেদের বিরুদ্ধ নহে, প্রত্যুত বেদের অনুবর্ত্তন করিতেছে। স্বয়ং তন্ত্র কি বলিতেছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। রুদ্রযামাল তন্ত্র বলেন—

"বেদেন লভ্যতে সর্ব্বং বেদাধীন মিদং জগৎ।
বেদমন্ত্রবিহীনো যঃ শক্তিমন্ত্রং সমভ্যসেৎ।
স ভবেদ্ধি কথং যোগী কৌলমার্গপরায়ণঃ॥" (১৫শ পটল)

ইহার অর্থ—"বেদের দ্বারা অভিলাষিত সমস্ত বিষয় লাভ করা যায়, এই জগৎ বেদের অধীন, যে মানব বেদমন্ত্ররহিত হইয়া শক্তিমন্ত্র অভ্যাস করে কৌলপথপরায়ণ সেই ব্যক্তি কিরূপে যোগী হইতে পারে ?"

বাঙ্গালার গৌরবরবি পূজ্যপাদ অধ্যাপক ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিতেন যে, তন্ত্রের মূল অথর্ব্ববেদের সৌভাগ্যকাণ্ডে নিহিত রহিয়াছে। তান্ত্রিক উপাসনার ভিত্তিস্বরূপ সৌভাগ্যকাণ্ডের অন্তর্গত "কাল্যুপনিষৎ" "সুন্দরীতাপিন্যুপনিষৎ" "ত্রিপুরোপনিষৎ" "ভাবনোপনিষৎ" "কৌলোপনিষৎ" প্রভৃতি উপনিষৎগুলিই এই বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অথর্ব্ববেদের সহিত তন্ত্রের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় রুদ্রযামল প্রভৃতি গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রযামলের সপ্তদশ পটলে ভৈরবী বলিয়াছেন—"হে মহাদেব! অনন্তর অথর্ব্ববেদের লক্ষণ বলিব, এই অথর্ব্ববেদ সকল বেদের সারস্বরূপ এবং শক্ত্যাচারসমন্বিত।" *

স্বনামপ্রসিদ্ধ যতিপ্রবর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী মহোদয় বলিতেন—তন্ত্র ও বেদ উভয়েই অনাদি। পূজ্যপাদ উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত উক্ত স্বামীজীর এতৎ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য।

৺তর্কালঙ্কার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "স্বামীজী! তন্ত্রের পরস্পর এত বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায় কেন ?" স্বামীজী ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—"কেবল তন্ত্রেই কি বিরোধ দেখিতে পাও, বেদপ্রভৃতি শাস্ত্রে কোনও বিরোধ প্রতীয়মান হয় না ?" উত্তরে উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"হাঁ বেদে বিরোধ আছে সত্য, কিন্তু জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ তাহার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।" অনন্তর স্বামীজী বলিলেন,—তন্ত্রেরও মীমাংসার অভাব ছিল না, যিনি তন্ত্রের বক্তা সেই মহেশ্বরই তন্ত্রের "মীমাংসাসূত্র" প্রণয়নের দ্বারা বিরোধভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন; পরমশৈব মহাত্মা পরশুরাম সেই সূত্রের বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই গ্রন্থ বিরলপ্রচার হওয়ায় তন্ত্রের বিরোধ প্রতিভাত হইয়া থাকে।" এই স্থলে স্বামীজী প্রসঙ্গত ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে শারীরক ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, শৈবাগমই তাহার প্রধানতম অবলম্বন।

বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী মনীষিবৃন্দের প্রদর্শিত অভিমতানুসারে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, বেদাদি শাস্ত্রের মূল যেমন মহেশ্বর, তেমনই তন্ত্রশাস্ত্রেরও মূল তিনিই। ইহার মূলান্তর খুঁজিতে যাইয়া বুদ্ধির উপর বা অন্য কাহারও উপর তন্ত্রকর্ত্তৃত্বের সমারোপ অনভিজ্ঞতারই সম্পূর্ণ পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে স্বয়ং তন্ত্রও সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছেন। স্বচ্ছন্দতন্ত্র বলেন—

"গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেব সদাশিবঃ।
প্রশ্নোত্তর পদৈ র্ব্বাক্যৈ স্তন্ত্রং সমবতারয়ৎ॥"

---

* অথ শিষ্যা বরৈর্যুতঃ সহস্রৈঃ
রণুযাতঃ স সুধন্বনা চ রাজ্ঞা।
ককুভো বিজিগীষু রেষসর্ব্বাঃ
প্রথমং প্রে রুদারধীঃ প্রথস্থে। ১৫ অঃ।
অভবৎ কিল তত্রতত্র শাক্তৈ
র্গিরিজার্চ্চাকপটান্মধু প্রসক্তৈঃ
নিকটস্থ বিতীর্ণভূরিমোদ
স্ফুটরিশ্বৎ পটুযুক্তিমান্ বিবাদঃ।১৫।২।
সহিযুক্তিভরৈ র্বিধায় শাক্তান্,
প্রতিবাগব্যাহরণেপিতানশক্তান্
দ্বিজজাতি বহিষ্কৃতা ন নার্য্যান্
ন করোল্লোকহিতায় কর্ম্মসেতুং।
অভিপূজ্য মাত্র রামনাথং
সহপাণ্ড্যৌঃ স্ববশে বিধায় বোলান্
দ্রবিড়াংশ্চ ততো জগাম কাঞ্চী
নগরীং হস্তিগিরে র্নিতিকাঞ্চীং।

* অথ বক্ষ্যে মহাদেব অথর্ব্ববেদলক্ষণম্।

ইহার অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, স্বয়ং সদাশিবই গুরুশিষ্যরূপে অবস্থিত হইয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তন্ত্রসমূহের অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং তান্ত্রর স্থানে স্থানে কোথাও ভৈরবীর প্রশ্ন ভৈরবের উত্তর এবং কোথাও বা ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়, পরমার্থতঃ ইহার কোনও মূল্য নাই, প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে কেবল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিই প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তার এবং প্রশ্নকর্ত্তার ভেদানুসারে "আগম" প্রভৃতি শব্দের যে নিরুক্তিবিশেষ দেখা যায়, ইহাও তন্ত্রগ্রন্থের শ্রেণীবিভাজক প্রণালীমাত্র বলিয়াই বুঝিতে হইবে। হরপার্ব্বতীর উক্তি-প্রত্যুক্তি ব্যতীত মুনিপ্রণীত এক শ্রেণীর তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গুলি উপতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত উপতন্ত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যাঁহারা বেদের আলোচনা করিতেন, বৈদিকানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন, তাঁহারাই তন্ত্রসরণির অনুসরণ করিয়া উপাসনার পথপ্রদর্শক বিবিধ তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। তন্ত্রপ্রণেতা বহু ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মহর্ষি গৌতমের "গৌতমীয় তন্ত্র" এবং "বৃহদ্-গৌতমীয় তন্ত্র" অদ্যাপি সুলভপ্রচাররূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। উক্ত তন্ত্র কৃষ্ণানন্দকৃত তন্ত্রসারের মেরুদণ্ডরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। উক্ত মহর্ষি তন্ত্রশাস্ত্রবোধক একখানা স্বতন্ত্রব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শারদাতিলকের রাঘবভট্টকৃত "পদার্থাদর্শ" নামক টীকায় উক্ত গ্রন্থের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় রাঘবভট্টের সময় পর্য্যন্ত তন্ত্রব্যাকরণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। প্রত্যুত উহার পঠন-পাঠনও প্রচলিত ছিল। এই উপাদেয় গ্রন্থ ইদানীন্তন তন্ত্রার্থবুভুৎসুর দৃষ্টিগোচর হইলে অনেক দুর্জ্ঞেয় স্থলের তাৎপর্য্য নির্ণীত হইতে পারিত; এমন কি অধুনা যাহা অশুদ্ধ,পুনরুক্ত অথবা অন্বয়ানুযোগী বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহারও দোষ বিদূরিত হইতে পারিত। গৌতমের ধর্ম্মসূত্র হিন্দুর নিকট অতি সুপরিচিত। ইহাতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের শৌচাচার প্রভৃতি অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহার ভাষা অতীব গূঢ়ার্থ। প্রাচীন নিবন্ধকারগণ গৌতমের যে যে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদতিরিক্ত সূত্রগুলির তাৎপর্য্য সহসা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় ছিল না। সম্প্রতি হরদত্তকৃত "মিতাক্ষরা" নামক টীকা প্রকাশিত হওয়ায় উক্ত সমগ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বুঝা যাইতেছে এবং ভাষার গূঢ়ার্থতাও প্রমাণিত হইতেছে। গৌতমীয় তন্ত্রের ভাষা আপাত দৃষ্টিতে তত জটিল বলিয়া প্রতিভাত না হইলেও উহাতে গূঢ়ার্থতার অভাব নাই। অতএব তন্ত্রের ভাষা বুঝাইবার অভিপ্রায়েই পরমকারুণিক

মহর্ষি স্বতন্ত্রব্যাকরণ-প্রণয়নে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, এমন বলা যাইতে পারে।

স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা প্রসিদ্ধ অগস্ত্যমুনিকৃত অনেক তন্ত্রবচন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত মলমাসতত্ত্বে অগস্ত্যসংহিতার অনেকগুলি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। অগস্ত্যসংহিতা তান্ত্রিক গ্রন্থ। তদ্ব্যতীত "অগস্ত্যতন্ত্র" নামক সুন্দরীবিদ্যাবিষয়ক অতীব প্রামাণিক তন্ত্রগ্রন্থের নিদর্শন ভাস্কর রায়কৃত সৌভাগ্যভাস্কর প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন; তন্ত্রসারে শ্রীবিদ্যার একটী মন্ত্র অগস্ত্যোপাসিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

স্মৃতিকর্ত্তা মনুপ্রভৃতির উপাসিত মন্ত্রের বিবরণও তন্ত্রশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়†। কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা মুনির তন্ত্রজ্ঞতাও তন্ত্রদর্শীর নিকট সুপরিচিত। ইঁহার মত "তারারহস্যবৃত্তিকা" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইনিও শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। এতৎপ্রণীত "ললিতা স্তবরত্ন" নামক শ্রীবিদ্যার উপাদেয় স্তোত্র অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। (পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ঈশ্বরাবতার ভগবান্ পরশুরাম তান্ত্রিক "কল্পসূত্র" রচনা করিয়াছিলেন।) "ভাস্করবিলাস" নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়,—সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর রায় এই কল্পসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্রের কল্পসূত্র প্রণয়নের প্রয়োজন বৈদিক কল্পসূত্র-প্রণয়নের অনুরূপ। বৈদিক কল্পসূত্র-রচয়িতা মনীষিগণ যেমন নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি শাখার জন্য এক একটী গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ তান্ত্রিক কল্পসূত্র-রচয়িতাও এক একটী দেবতার অর্চ্চনাদি প্রতিপাদক স্বতন্ত্র কল্পসূত্রের রচনা করিয়াছেন। কাম্য প্রভৃতি পঞ্চদশ শাখার জন্য যেমন কাত্যায়নীর কল্পসূত্র, সেইরূপ সমস্ত সুন্দরীতন্ত্রের জন্য পরশুরামের "কল্পসূত্র" রচিত হইয়াছিল।

শিষ্টজন কর্ত্তৃক পরিগ্রহণ শাস্ত্রের প্রামাণ্য-নির্ণায়ক হেতু বলিয়া আর্য্য মনীষিগণ নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া থাকেন। উপর্য্যুক্ত শিষ্টগণের তন্ত্রসরণি পরায়ণতার প্রমাণ দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যবিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

স্নান আচমন সন্ধ্যা প্রভৃতি দীক্ষিত হিন্দুর অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক বিষয়ই বৈদিক ক্রিয়ার অনন্তর তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি তান্ত্রিক অনেক ক্রিয়াতে খাঁটি বৈদিক মন্ত্রেরই বিনিয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এই

বিষয়ে উদাহরণের অভাব নাই। অদ্যাপি নানাদেশবাসী সদাচারসম্পন্ন দ্বিজাতিগণ বৈদিকানুষ্ঠানের সহিত তান্ত্রিকানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। বারাণসী-পুরীবাসী স্বনামধন্য অগ্নিহোত্রী সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী মহোদয়ের তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠান এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ত্রৈলিঙ্গ ব্রা দৈনিক বেদপাঠের ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠাতা।

শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য এই পঞ্চবিধ উপাসকই তন্ত্রমার্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা, বলেন চৈতন্য রামানুজ বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে তন্ত্রের নাম-গন্ধও নাই তাঁহারা ভ্রান্ত। তত্তৎসম্প্রদায়ের দীক্ষাপদ্ধতি, নিত্যনৈমিত্তিক পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি অনুসন্ধান করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে তত্তৎসম্প্রদায়ের পদ্ধতি-গ্রন্থও এখন আর বিরলপ্রচার নহে। বঙ্গদেশীয় চৈতন্য সম্প্রদায়ের গোস্বামিগণ ানন্দের তন্ত্রসারের পদ্ধতি-অনুসারেই দীক্ষাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

প্রদর্শিত বাক্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে তন্ত্রের মূল কোথায় তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের সর্ব্বজনীন উপাসনা-প্রতিপাদক তন্ত্রশাস্ত্র সর্ব্বদেশের বিদ্বজ্জনগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছে।

হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পরস্পর এতই সুসংশ্লিষ্ট যে, একের সাচিব্য ব্যতীত অন্যের যথাতথ্যোপলব্ধি হয় না, এবং অনেক অনুষ্ঠানও ইতরনিরপেক্ষরূপে সত্তালাভ করিতে পারে না। বেদ বুঝিতে হইলে বেদাঙ্গ পড়িতে হয়, আবার বেদাঙ্গ বুঝিতে হইলেও বেদার্থাবগতির আবশ্যকতা অনুভূত হয়। গৃহ্যোক্ত উপনয়ন সংস্কার ব্যতীত বেদপাঠেরই অধিকার হয় না। উক্ত সংস্কারের উপযুক্ত কালাদি নির্ণয় ধর্ম্মসংহিতা প্রভৃতিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। উপনিষদে দেবতার একত্ব বহুত্বের সামঞ্জস্য বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মসংহিতায় দৈনিক দেবতার্চ্চনের কর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে দেবতার মন্ত্র, ধ্যান এবং উপাসনার উপযোগী অন্যান্য যাবতীয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মন্ত্রোদ্ধার-প্রণালী বিশেষরূপে কথিত হওয়ায়, এই শাস্ত্র মাধবাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ কর্ত্তৃক "মন্ত্রশাস্ত্র" নামেও অভিহিত হইয়াছে। দেবতার আবির্ভাবকাল, উৎপত্তি-বিষয়ক আখ্যায়িকা, মূর্ত্তিনির্ম্মাণের নিয়মাবলী প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্রে অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তন্ত্র বুঝিতে হইলে বেদ স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়। এই শাস্ত্র গু

শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির বলে ইহার মর্ম্মার্থাবগতির সম্ভাবনা নাই। এমন কি, উপাসনায় গুহ্য বিষয়গুলি নিবন্ধকারগণ গ্রন্থমধ্যে নিহিত করেন নাই। তাঁহারা এই মাত্র বলিয়াছেন যে, "এতচ্চ গুরুমুখাদবগন্তব্যম্" অর্থাৎ এই বিষয়ের রহস্য স্ব স্ব গুরুর নিকট অবগত হইবে।

সম্প্রদায়ভেদে উপাসনা-প্রণালীর অত্যন্ত পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে সাম্প্রদায়িক মতের এতই প্রভুত্ব যে, অনেক স্থলে মন্ত্রাদিতে মূলবচনোক্ত অর্থের অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও মূলবচনোক্ত একটি বর্ণ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কোথাও বা অযুক্ত বর্ণের সংগ্রহ হইয়া থাকে। "কেন এমন হয়," এই প্রশ্নের অবকাশ নাই। কারণ, তন্ত্রশাস্ত্রদর্শী আস্থাবান্ উপাসকগণ নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সাম্প্রদায়িক প্রভুত্বের মর্য্যাদা শিরোধার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন। রাঘবভট্ট, শ্রীমৎপূর্ণানন্দগিরি প্রভৃতির গ্রন্থে এতদ্বিষয়ের ভূরি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

"তন্ত্রের প্রচারভূমি কেবল বঙ্গদেশ অথবা প্রদেশান্তরেও উহার প্রভাব আছে?" ঈদৃশ সংশয়ের নিরসন মাধবাচার্য্য 'ভোজদেব' শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বিভিন্নপ্রদেশবাসী মনীষিবৃন্দের তন্ত্রপরায়ণতা প্রদর্শনের দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তথাপি স্থূলনিখনন ন্যায়ানুসারে পুনরায় এই বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যুত এই বিষয়ের অধিক বিচারই নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হয়। কারণ, তন্ত্রের প্রভাব বাঙ্গালা প্রভৃতি কতক স্থানেই পরিচ্ছিন্ন, এই ভ্রান্ত ধারণা যে অনেক দিন হইতেই কতিপয় মানবের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এই—

গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলৈঃ প্রচলীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ঙ্গতা॥

ইহার অর্থ—গৌড়দেশে তন্ত্রবিদ্যা প্রকাশিত অর্থাৎ প্রথম দেখা দিয়াছিল। তৎপর মিথিলাবাসিগণ কর্ত্তৃক ইহার প্রাবল্য সম্পাদিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের কোন কোন স্থানে উহার আবির্ভাব হইয়াছিল। গুর্জ্জরদেশে ইহা প্রলয় প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেখানে দেখামাত্র দিয়াই বিনষ্ট হইয়াছে।

তন্ত্রের প্রচার-স্থানবিষয়ে ঋষিদিগের উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সভ্যজনাধ্যুষিত ভারতের প্রত্যেক বিভাগেই তন্ত্রের প্রভাব প্রকটিত হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দকৃত তন্ত্রসারে বিদ্যাধরাচার্য্য নামক প্রাচীন নিবন্ধকার-

ধৃত জাবাল-বচনাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অর্থ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যদেশ, কুরুক্ষেত্র, লাট, কোঙ্কন, অন্তর্ব্বেদি এবং অবন্তী এই সকল দেশে সমুৎপন্ন গুরুসকল উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। গৌড় শাল্ব সুর মগধ কেরল কোশল এবং দশার্ণ এই সকল দেশজাত গুরু মধ্যম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। কর্ণাটদেশজ নর্ম্মদাতীরোদ্ভব রেবাতীরোদ্ভব কচ্ছতীরোদ্ভব কলিঙ্গদেশজ কলম্বদেশজ এবং কাম্বোজদেশজ গুরু অধম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন।

অত্র পরিগণিত গুর্ব্বধিষ্ঠিত দেশসমূহের মধ্যে কুরুক্ষেত্র দেশ মনুসংহিতায় ব্রহ্মর্ষিদেশ বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে, এবং এতদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণদিগের আচার পৃথিবীস্থ সমস্ত মানব কর্ত্তৃক অনুকরণীয় বলিয়াও কথিত হইয়াছে। মধ্যদেশও মনূক্ত পবিত্র দেশ বলিয়াই পরিচিত। সুতরাং যে দেশ বেদোক্ত যাগাদির অধিষ্ঠান সে দেশেও তান্ত্রিকানুষ্ঠানের অভাব ছিল না, এরূপ বলা যাইতে পারে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ঊষা।

এস ঊষা নামি
আকাশের প্রথম দুহিতা,
আলোকের রাণী!
ম্লান ব্যোমপথে
মূর্চ্ছাতুরা পড়ে আছে ভগিনী তোমার
শ্রান্ত নিশীথিনী,
কোন দূরে গেছে তা'র নক্ষত্রের হার,
শুধু জাগে মাথে
পাণ্ডু শুক-তারা তা'র নীলকান্ত মণি!

চাহ তা'র পানে
ভাষাহীন করুণ নয়নে:
আসি ধীরে বস' তা'র পাশে
আনত আননে;
হেম কেশজাল এলায়ে পড়ুক্ সঙ্গীতের মত
মধুর প্লাবনে,
রজনীর ঘন-কৃষ্ণ কেশদামে মিশি' তব কেশ
কনক রচন
মৌন বৃদ্ধ গগনের অপরূপ মায়া-আবরণে!

হিরণ্ময় করে কর সঞ্চালন আপনার কনক-অঞ্চল
সুকোমল, নিত্য সুবাসিত;
নন্দন হইতে আসিবে সমীর, সঙ্গে ল'য়ে সুর-পরিমল
পারিজাত-পরাগ-চর্চ্চিত;
পুষ্পপুটসম রক্ত ওষ্ঠ তব কর ঊষা নীরবে স্থাপন
রজনীর স্তব্ধ শ্রুতিমূলে;
তন্দ্রাঘোরে সে পরশ-ফলে
হয় ত' ভাবিবে বামা, আসিয়াছে নিষ্করুণ হৃদয়ের নাথ;
সব ব্যথা-অভিমান ভুলে
শান্ত আঁখি খুলিবে সে, হেরিবে তোমায়;
তা'র পর ভাসি নেত্র-জলে
কণ্ঠলগ্ন হ'বে তব;
নভঃ সরোবরে আলিঙ্গিয়া রবে
কুবলয় স্বর্ণ শতদলে!

যদি নিশা নাহি মেলে আঁখি পরশে তোমার,
রহে পড়ি গগন-অঙ্গনে,
আঁধার শয়নে,
অসহ্য ব্যথায় ছিন্নতন্ত্রী বীণা যথা রহে
দীপহীন প্রমোদ-ভবনে,
দীর্ণ রিক্ত মনে,

যদি তা'র হৃদয়-স্পন্দন লুপ্ত ফল্গু সম
শুধু বহে অন্তঃশিলা,
যেও ঊষা! অদূরে যেথায় আকাশ-গঙ্গার
আছে শ্বেত ঊর্ম্মিমালা ;
ভরিয়া অঞ্জলি নিও নীর অয়ি স্নেহময়ি!
দিও তা'র মাথে বার বার ;
দিও শ্লথ করি বিজড়িত অঙ্গের বসন,
বিন্দু বিন্দু বারি-মুখে তা'র।

তিলে তিলে অবলুপ্ত প্রাণ ফিরিয়া আসিবে দেহে,
ক্ষীণ নদী-বুকে
আসে যথা জলস্রোত সচকিত শঙ্কিত আবেগে
নীরব পুলকে ;
নবীন নটিকা যথা শত-চক্ষু. ব্যগ্র সভামাঝে
রুদ্ধবাক্ রহি,'
উঠে সপ্তস্বরা-তানে মৃদু মৃদু সঙ্কোচ তেয়াগি'
কলকণ্ঠে গাহি,'
নিশার অবশ শিরা তেমতি ধ্বনিত হ'বে
রক্তের স্পন্দনে
নিশ্চল নীলিম-ভালে আকুল অলক-জাল
মলয়-নর্ত্তনে
লীলায়িত হ'বে পুন ; স্তিমিত নয়ন-যুগে
জাগিবে আলোক ;
দুলাইবে দেহলতা অমর জীবনভার—
অমরার শোক।
অসংবৃত মুক্ত কেশপাশ সংবরিয়া লবে
মন্থর-চরণা,
সিক্ত কেশ, নীলাম্বর হ'তে ঝরিয়া পড়িবে
শিশিরের কণা।
যাবে বামা গেহে তা'র আকাশ সাগর যেথা

আছে মেশামিশি,
যেথা কাল পাথরের আঁধার-প্রাসাদে
বারুণী রয়েছে বসি'।
চলে গেছে নিশা অই যেথায় ঘুমায়ে আছে
কৃষ্ণ-পারাবার
হের ঊষা! হের মাতা! ধরণী ত্যজিতে চাহে
বায়ু-শয্যা তা'র,—
চঞ্চল বালিকা সম, ঘন সুপ্তি ঘোরে সে যে
আবর্ত্তিয়া যায়,—
কর' প্রসারিত আলোক-অঙ্গুলি, ডাক' তা'রে
আলোর ভাষায় ;
নতুবা হয় ত' ধরা মোহ-নিদ্রাবশে ছাড়ি'
পবন-হিন্দোল,
নিপতিত হ'বে যেথা প্রবাহিত দিশাহীন
তিমির-কল্লোল!

জাগিয়াছে ধরা
ঊর্দ্ধমুখে আছে যতেক সন্তান
চাহি তোমা পানে,
শুন পাতি কাণ,
তুলেছে ধরণী আবাহন-গান,
পাখীর কূজনে আর তটিনীর তানে!

রহ ক্ষণকাল, অয়ি স্মিতাননা!
প্রদাপ্ত স্পন্দনে,
কর আশীর্ব্বাদ হর্ষ-প্রীতিভরে
অসংখ্য নন্দনে,
অভিষিক্ত কর চিত্ত তাহাদের
আলোক-ধারায় ;
গিরি-চূড়া, তরুশির, মন্দির-কলস

পুষ্পশিশু, তৃণদল শ্যামল সরস,
পথ নদীধার, কানন, কান্তার
উজলি উঠুক্ আজি কনক আভায়!
তা'র পর হও অগ্রসর সম্মুখে তোমার
দেশে দেশে কর গো প্রচার
নূতন-জীবন বার্ত্তা, চির-সঞ্জীবনী,
সবিতার অরুণ সারথি,
দ্যুলোকের রাণী!

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

শক্তি।

ফুটাও করুণাবলে হে বিশ্ব-মোহিনী,
এ চিত্ত গহন বনে সৌরভিত ফুল!
ভেদিয়া পাষাণ বুক স্নিগ্ধ-স্রোতস্বিনী,
বহাও দিবস-নিশি মৃদু কুলুকুল্।
আমি হীনবল দেবি এ মর ভবনে,
সাধিতে তোমারে চির-সাধনা-রূপিণি!
ঝলে দীপ্ত রূপতারা শোভার গগনে,
শ্রীঅঙ্গ সৌরভে পূর্ণ আকাশ-মেদিনী!
তুমি মহামায়া শক্তি এ বিশ্ব-মাঝারে,
উজ্জ্বল বিধির সৃষ্টি তোমারি প্রভায়!
শক্তিহারা চিররুদ্ধ মর্ত্ত্য-কারাগারে,
এ দুর্ব্বল জীবনের যামিনী পোহায়!
দাও শক্তি, মহাশক্তি! যেই শক্তি-বলে,
মানব, মানব হয় মানব-মণ্ডলে!

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

বাঙ্গালী কবির স্বদেশ-প্রেম।

(শেষ প্রস্তাব)

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময় বাঙ্গালায় যে বিরাট আন্দোলন হয় তাহার ফলে দেশে জাতিবৈর পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল, এতদিন দেশাত্ম-বোধের ভাব শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন ইহা দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তখন বাঙ্গালার কতিপয় যুবক বোমা ও পিস্তলের সাহায্যে বিদেশীর হস্ত হইতে দেশমাতার মুক্তিসাধন করিবেন—বিদেশী কর্ম্মচারী এবং এমন কি উচ্চরাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেশী কর্ম্মচারীর রক্তপাত করিয়া, শাসনযন্ত্র শিথিল করিয়া স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিবেন—এই দুরাশা তাঁহাদের কল্পনা অধিকার করিয়াছিল। বিদেশ হইতে বন্দুক-কামান রপ্তানি করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল—ভারতের বাহিরে ইংরাজ-বিদ্বেষী জাতিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার উদ্যম চলিতে লাগিল—প্রকাশ্য রাজপথে অবাধে হত্যা চলিতে লাগিল। "যুগান্তরে"র উদ্দীপনা-পূর্ণ প্রবন্ধ ও কবিতা, এবং ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই আন্দোলনের সময় কাব্যবিশারদ, রজনীকান্ত, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ কবিতা, গান ও নাটকের সাহায্যে দেশভক্তি ও স্বদেশ-হিতৈষণার ভাবে সমগ্রদেশ প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের স্বদেশী গান তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবার জন্য দেশবাসীকে তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। দেশের কাজ করিতে প্রাণপাত করিলেও তাহা সার্থক; লালটুপি কিম্বা কাল কোর্ত্তা জুজুর ভয় আর চলিবে না। মোহ-নিদ্রার আবেশে অচেতন বাঙ্গালী তাহার নিজ অবস্থা, তাহার স্বরূপভাব বুঝিয়া দেখুক্। জীবনধারণের উপযোগী সহজ-লভ্য অথচ খাঁটি জিনিষ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাত মনোরম চাকচিক্যে মোহিত হইয়া গিয়াছে—সে নিজের মরাই শূন্য করিয়া বিদেশে খাদ্য-দ্রব্য রপ্তানি করে—তাহার

গাভী দুগ্ধহীনা—বিলাতী জমাট দুগ্ধ ব্যতিরেকে তাহার রোগী পথ্য পায় না—তাহার শিশু বাঁচে না—গো-শূকর-রক্তে পরিষ্কৃত শর্করা ও লবণ ভিন্ন তাহার জিহ্বার তৃপ্তি সাধন হয় না। কাব্যবিশারদ সোজা কথায় বাঙ্গালীকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া তাহার আর্থিক উন্নতি করিতে মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত ব্যতীত অপর কেহ বাঙ্গালীকে তাহার ঘরের দিকে লক্ষ্য করিতে উপদেশ দেন নাই। দুঃখিনী মায়ের সন্তান বাঙ্গালী—"মায়ের দওয়া মোটা কাপড়" তাহারা "মাথায় তুলিয়া" লউক—লজ্জা নিবারণ করুক।

মায়ের ঘরের শুধু ভাত
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব

মা'র বাগানের কলার পাতে ঢালিয়া নিজ জঠরজ্বালা নিবারণ করুক—ইহাই তাহার আত্মমর্য্যাদা—আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কারণ,

ভিক্ষার চালে কায নাই—সে বড় অপমান;
মোটা হোক্—সে সোণা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান!
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।
মিহি কাপড় প'রব না আর যেচে পরের কাছে,
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় পর্‌লে কেমন সাজে;
দেখ্‌তো পর্‌লে কেমন সাজে।

যদিও—

আমরা নেহাৎ গরীব—আমরা নেহাৎ ছোট—
তবু আছি সাত কোটি ভাই—জেগে ওঠ!

ঘরে তাঁত জুড়িয়া দাও—দোকান সাজাইয়ে ফেল—গোলার ধান বিদেশে যাইতে দিও না—মোটা খাও, মোটা পর—ল্যাভেণ্ডার-অটোতে কাজ নাই—এমন সুদিন হারাইও না—এমন সুবাতাস ছাড়িও না—জাতীয় উন্নতির তরী-খানি জোয়ারে ছাড়িয়া দাও—"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি" মাথায় তুলিয়া লও,—সেখানকার সলিলে মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়—তথাকার "অনিলে মলয় সদা বহমান"—নন্দনকাননের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ইহার নিকট ম্লান হইয়া যায়। রজনীকান্ত বাঙ্গালাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। তিনি "যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত," "ধূর্জ্জটী-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রিমণ্ডিত," "সিন্ধু-গোদা-বরী-মাল্য-বিলম্বিত," "রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত," "অর্জ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত"

বিশাল ভারতভূমির অতীত গৌরবকাহিনী কীর্ত্তনের সময় স্বীয় শক্তির অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কারণ সেখানে এক সময় "গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান" এবং ভারতের পূর্ব্বগৌরব তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইলে তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

রজনীকান্তের দেশাত্মবোধের বৈশিষ্ট্য—কেবল সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা, দোয়েল-শ্যামা-পিকবর-মুখরিতা বাঙ্গালাকে ভালবাসিয়া নহে—তিনি হিমাদ্রি-কিরীটী, সাগর-মেখলা ভারতমাতায় চিন্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং হৃদয়ের অন্তরতম প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে ভক্তিভরে পূজা করিয়াছিলেন।

যিনি মাতৃমূর্ত্তির "মনোমোহন মুরতি"কে স্বদেশ-ভক্তির মন্দাকিনীজলে স্নাত করিয়াছেন—যিনি ব্যঙ্গকবিতায়, নাটকে, সঙ্গীতে বাঙ্গালীজাতির দেশাত্মবোধ উদ্বোধিত করিয়াছিলেন—যিনি স্বদেশকে "সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি" বলিয়া "যে দেশেতে জন্ম আমার সেই দেশেতে মরি", এইরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন—সেই দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দীপনাময়ী কবিতা ও গানের ঝঙ্কার এখনও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। স্বদেশপ্রেমিক নিজ সমাজের দূষণীয় আচার-ব্যবহার "প্রেমের উচ্ছ্বসিত ধারায়" আবৃত করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকে যথার্থ স্বদেশহিতৈষণা বলিতেন না—তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিতেন। সামাজিক ব্যাধি দূর করিয়া সমাজকে উন্নত করিতে না পারিলে জাতির মঙ্গল হইতে পারে না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নিদ্রিত সমাজকে কখনও কশাঘাত করিয়াছিলেন, কখনও বা তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি "নুরজাহান" নাটকে হিন্দু-সমাজের সঙ্কীর্ণতার জন্য দুঃখ করিয়াছেন; অপর জাতিকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মণ সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি ও ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়াছিল, ইহাই যে তাহার অধঃপতনের মূল তাহা তিনি "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে দেখাইয়াছেন। আবার নিজ ক্ষুদ্র রাজ্য বা আভিজাত্যের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর দেশকে ভালবাসিতে না পারিলে প্রতাপের ন্যায় মহাবীরের দেশপ্রাণতা বিফল হয়—ইহা তিনি "প্রতাপ-সিংহ" নাটকে স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে সেকেন্দারের মুখ

দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল দেশমাতার অপরূপ সৌন্দর্য্যের কথা শুনাইয়াছেন—এই দেশে দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য গাঢ় নীল আকাশে অগ্নিবর্ষণ করে—তামসী রাত্রিতে নক্ষত্র-পুঞ্জ চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দেয়—প্রাবৃটে তথায় ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে আকাশ ছাইয়া দেয়—যেখানে "অভ্রভেদী ধবল তুষার মৌলি নীল হিমাদ্রি" দণ্ডায়মান আছে—বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে সাগরের দিকে ছুটেছে—সেই দেশ কত মহান্! কত সুন্দর। কত মহিমাময়! দেশ প্রাণতায় যে অমৃতরস বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় মহাসঙ্গীতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল —তাহার পরিণতি দ্বিজেন্দ্রলালের "আমায় দেশ" শীর্ষক গানে। বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনকে স্বদেশপ্রেমের প্রতিকূল বলিয়া তাহা তিনি অনুমোদন করেন নাই। যদি দেশবাসী বিজাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া কল্যাণের পথে ধাবিত হয়—অন্ধবিদ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া নিজ উন্নতির দিকে লক্ষ্য করে তাহা হইলে তাহাদে উদ্ধার হইবে, নতুবা নহে। শত্রুর নিকটও শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্ট আছে—মিত্র অথচ মেকী ভণ্ডকে দূর করিয়া দিতে হইবে, নতুবা বৃথা গর্ব্ব ও আস্ফালন যথার্থ উন্নতির পরিপন্থী। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন—

শত্রু হয় হোক্ না, যদি
সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাস্‌তে শেখ্,
তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হো'ক্—ভণ্ড যে—
তাহারে দূর করিয়া দে,—
সবার বাড়া শত্রু সে,—
আবার তোরা মানুষ হ'॥

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি কোন জাতির প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে না! তাঁহার দেশভক্তি মৈত্রী ও করুণার উৎসে ধৌত। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য—ইহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। এই আদর্শ স্বদেশ-প্রেম-সাধনা তাঁহার জীবনের পরম লক্ষ্য ছিল। তাঁহার সেই সাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জাতিকে বড় করিতে হইলে, হৃদয়কে উদার করিতে হইবে—সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে হইবে, এইজন্য তিনি বলিয়াছেন—

জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়া নহে—জাতীয় উন্নতির

পথ আত্মলঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে, বিদ্বেষ বর্জ্জন ক'রে নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত ক'রে দিয়ে।"

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
ভুলিয়ে যারে আত্মপর,—পরকে নিয়ে আপন কর।
বিশ্ব তোর নিজের ঘর, আবার তোরা মানুষ হ'॥

"মেবার পতন" নাটকে কবি দেখাইয়াছেন যে, জাতীয় প্রেম হইতে বিশ্ব-প্রেম গরীয়সী। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন—

"হাসির গানে বাঙ্গালী জাতির প্রতি মমত্ববোধের প্রথম বিকাশ হইয়াছে, সে মমত্ববোধ "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটি গানে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই মমত্ববোধের স্ফুরণ হইয়াছে দেশাত্মবোধে; "দুর্গাদাস" ও "রাণা প্রতাপ" নাটকে এই দেশাত্মবোধ ষোল কলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। "নুরজাহান" "সাজাহান" প্রভৃতি নাটকে জগদ্ব্যাপিনী প্রীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। * * * প্রীতির এই জগন্ময়তাকে আত্মময়রূপে প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার অবসর দ্বিজেন্দ্রলালের হয় নাই।"

কিছুদিন হইল সত্যেন্দ্রনাথের বীণা নীরব হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গবাণীর জনৈক একনিষ্ঠ সাধক সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রাণের টান এই কয় পংক্তিতে সুপরিস্ফুট হইয়াছে—

কোন্ ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পাব—
বাউল সুরের মধুর তান?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদের বাংলা রে?

সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা দেশের যে মোহন ছবিখানি আঁকিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। যে দেশের তরুলতা "সকল দেশের চাইতে শ্যামল"—যেখানে সোণার ফসল ফলে—সোণার কমল ফোটে—যেখানে দোয়েল, শ্যামা, ফিঙ্গে গাছে গাছে নাচে

—যে দেশের দুর্দ্দশায় আমরা দুঃখ পাই—তাহার গৌরবের কথায় আমাদের বুক স্ফীত হয়—সেখানে পিতৃপিতামহদের চরণধূলি পাওয়া যায়। এমন দেশের অধিবাসী তোরা বাঙ্গালী—এখন

আপন পন্থা নে রে চিনে,
স্থান-হারা মানহারা হ'য়ে থাক্‌বি কিরে চিরকালই !
যদি কথায় ও কাজে তোরা ধন্য হ'তে ইচ্ছা করিস্, তাহা হইলে—
প্রতাপের আহ্বানে তোরা
জেগেছিলি যেমন সবে,
(নিমা'য়ের প্রেম আলিঙ্গনে
মিলেছিলি যেমন সবে)
ওরে তেম্নি আবার যারে মিলে, জগৎ দেখুক নয়ন মেলি !

আবার ভারতবাসীকে ডাকিয়া কবি বলিতেছেন—

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয়।

এখন আমরা বঙ্গবাণীর প্রধান পুরোহিত—মাতৃমন্দিরের শ্রেষ্ঠ উপাসক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমানে বহু ভক্ত কবিতাপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বাণীমন্দিরের বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান। স্থান ও সময়ের অভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিতে বিরত হইলাম।

যখন বাঙ্গালাদেশ দেশ-ভক্তির তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাব-প্রবণ কবি-হৃদয় নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ স্তরে স্তরে অগ্রসর হইয়া বিশ্বপ্রেমে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার নয়নাভিরাম শোভাসম্পদ্ কবি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার বাতাস তাঁহার প্রাণে বাঁশি বাজায়—ফাল্গুনে আমের বনের সুন্দর আঘ্রাণে তাঁর মন পাগল করে—আশ্বিনে বাঙ্গালার ভরা-ক্ষেতে কি সুন্দর মধুর হাসি তিনি দেখিতে পান! আবার সেই ভুবনমনোমোহিনী-সূর্য্যকরোজ্জ্বলধরণী—সামগান-নিনাদিত—জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা ভারতমাতার মূর্ত্তি কল্পনানয়নে দর্শন করিয়া তিনি বলিতেছেন—

ওগো মা! তোমায় হেরে
আঁখি না ফিরে—
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোণার মন্দিরে।

জগজ্জননীর এক হস্তে অসি—অপর হস্তে তিনি অভয় প্রদান করিতেছেন। এই মূর্ত্তি যেন আলোক ও ছায়া—শান্ত ও ভয়ঙ্কর—রুদ্রভাব ও করুণ-ভাবের সংমিশ্রণ।

দেশ-প্রেমিক কবিগণ দুই প্রকারে নিজেদের প্রাণের জ্বালা প্রকাশ করেন—তাঁহারা হয় অতীতের গৌরবকথা প্রচার করেন, নতুবা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আদর্শ সমাজে অঙ্কিত করেন। দেশপ্রাণতা জাগাইয়া তুলিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ভারতের অতীত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল পৃষ্ঠা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি শিখবীরের আত্মত্যাগের কথা শুনাইলেন; শিবাজীর মহাপ্রাণতার উল্লেখ করিয়া ভারতের সনাতন রাজধর্ম্মের পরিচয় দিলেন। আশা-ভরসা-হীন উদ্যমহীন ভীরু মনকে আশ্বস্ত করিয়া স্বাধীনতার দিনের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের কথা শুনাইয়াছেন। জাতি অবসাদ-হিম হইতে উত্থিত হইবে—ঘোর তমোনিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ হইবে—সকলে আত্মপর ভুলিয়া সেই জাতীয়-জাগরণের রক্তিম-আভা-উদ্ভাসিত নূতন প্রভাতে কোটী শির তুলিয়া—নব-আশা-প্রফুল্ল সহাস্য আননে পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে।

সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে।

রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যতের আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করিলাম—

এই সব মূঢ় ম্লান-মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,
ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমার চেয়ে ;
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

* * * *

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে—তবে তাই কর আজি দান ;
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার !
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি
একবার নিয়ে এস স্বর্গ-হ'তে বিশ্বাসের ছবি।"

তাই তিনি বলিতেছেন—

হে রুদ্র বীণা বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
আঁধার নাশিবে, তা'রাও আসিবে দাঁড়াবে ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

জাতীয় অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রাণস্বরূপ।

কিন্তু মহাকবি কাব্যাদর্শের এই ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া সীমাবদ্ধ দেশাত্ম-বোধের গণ্ডী হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভারতের সেই চিরপুরাতন সনাতন বাণী কবির হৃদয় ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল—তাই তিনি সর্ব্বজনীনতা ও সর্ব্বভূতে—স্থাবর-জঙ্গমে শ্রীভগবানের সত্তানুভব করিয়া ভূমানন্দে লীন হইলেন, উপনিষদের সেই মহাবাক্য "ভূমা বৈ সুখম্—নাল্পে সুখমস্তি"—তাঁহার কবিস্বপ্নময় শান্ত সৌম্য সুমধুর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব অলৌকিক ভাব জন্মাইয়া দিয়াছিল। যখনই কোন একটা বিবেক ভাব—কোন একটা খণ্ডচিন্তা তাঁহার হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাঁহার উদারতায় বাধা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই তিনি সেই ভাবের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। যখন স্বাদেশিকতা, দেশাত্মবুদ্ধি তাঁহার হৃদয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিতেছে এবং তাঁহার মুক্ত ব্যোম-বিহারী কবিকল্পনা তাহার চাপে আড়ষ্ট হইবার উপক্রম করিতেছে, তিনি বুঝিতে পারিলেন—তখনই তাঁহার আত্মা বিশ্বরাজ্যের অনন্ত উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করিয়া এক অপরূপ প্রাণমাতান গান আরম্ভ করিল। তাঁহার মহাপ্রাণতা, কল্পনা ও ভাব-প্রবণতায় পুষ্ট হইয়া

জাতিগত, বর্ণগত পার্থক্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবতার উদারভাবে পর্য্যবসিত হইল। পৃথিবীর সমস্ত জাতি বিশিষ্টতা ভুলিয়া গিয়া—স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত-ঈর্ষাদ্বন্দ্ব, প্রীতি ও ভালবাসায় ডুবাইয়া দিয়া—দেশ, জল, পর্ব্বত প্রভৃতির বাঁধ মুছিয়া দিয়া—এক অখণ্ড বিশ্বমানবসাম্রাজ্যে পরিণত হউক, ইহাই রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার পরিণতি। তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন,

জগৎ জুড়ে, উদার সুরে
আনন্দ-গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে ?

Tennysonও একদিন এই বিশ্বমানবরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—

Till the war-drum throbb'd no longer,
And the battle-flags were furl'd,
In the Parliament of man,
The Federation of the world.
There the common sense of most
Shall hold a fretful realm in awe,
And the kindly earth shall slumber,
Lapt in universal awe.

ফরাসী দার্শনিক August Comte অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সকল যুগের মানুষ লইয়া বিশ্বমানবের কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি sociocracy বা সামাজিক সাম্রাজ্য-প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। এই সাম্রাজ্য-পরিচালনে কোনও বাঁধা নিয়ম (fixed institution) থাকিবে না। কিন্তু ভাষাগত, ভাবগত বৈষম্য সত্ত্বেও—স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতের অস্তিত্ব সত্ত্বেও—জাতিসমূহের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পার্থক্যসত্ত্বেও বিশ্বমানবকল্পনা—সামাজিক-সাম্রাজ্য-কল্পনা একটা উদ্ভট কল্পনা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। Dr. Hoffding তাঁহার Brief History of Modern Philosophy নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"Thus the founder of positivism ends up as a utopian romantist অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদের স্থাপয়িতা অবশেষে উদ্ভট কাল্পনিক হইয়া দাঁড়াইলেন। Herbert Spencerও জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সামরিক যুগের অবসান হইবে ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু জাতিতে জাতিতে ভালবাসা-প্রীতি

সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি ত দূরের কথা, ঈর্ষার দাবানল জ্বলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া Spencer শেষ বয়সে ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

Comte, Spencer Tennyson ও রবীন্দ্রনাথের এই মতে মহাপ্রাণতার আভাস আছে—করুণা, উদারতা ও প্রেমের পরিচয় আছে। বোধ হয় বস্তু-তন্ত্রহীন মনোজ্ঞ আদর্শ কবিকল্পনা-প্রসূত ও কার্য্যকরী নহে ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বভারতী"-স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছেন। বাহিরের ভেদ দূর করিতে হইলে, মানসিক ভিন্নতার লোপ করিতে হইবে। "ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ", এই মহাবাক্যের সত্যতা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জীবন-সন্ধ্যায় "বিশ্বভারতী"র উদ্বোধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদান-স্থাপন করিবার জন্য—ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও অনন্তজ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার জন্য—পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের সহিত চিন্তা করিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স, জর্ম্মণী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণকে শান্তিনিকেতনের আদর্শ বিদ্যালয়ে আহ্বান করিতেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনের সুফল কালে দেখা যাইবে। ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ললিতকলার পুনরুদ্ধার হইলে পৃথিবীর অপর জাতি-সমূহ বুঝিতে পারিবে যে, প্রাচীনকালে ভারতে এক বিরাট্ সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল—ভারতবাসী জগৎ-সভায় নিজ প্রাপ্য স্থান অধিকার করিতে পারিবে এবং নিজের অভাব ও নিশ্চেষ্টতা উপলব্ধি করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টিত হইবে। প্রাচীন ভারতের শান্তিসুখময় তপোবনে যে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার মোহনবাণী জীবনযুদ্ধের কোলাহলময় পাশ্চাত্য খণ্ডে শান্তিবারি সেচন করিবে—দ্বেষ ও ঈর্ষার বহ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। ভারতবাসী তাহার অপূর্ব্ব উচ্চ আদর্শ ঘোষণা করিয়া পরস্পর বিবদমান পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের মধ্যে প্রীতি, সৌভ্রাত্র ও মৈত্রীর ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম-এ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সোণামুখী ছুচ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামভুঁইয়ার পথে।

তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণাঙ্গীর কালো পায়ে অলক্তরাগের মত পশ্চিম দিগন্ত রেখায় গাঢ় লাল আভা; দূরে অন্তহীন বনের মাথার উপর কে যেন একটা জমাট বাঁধা অন্ধকারের বিরাট টোপর পরাইয়া দিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ; মাঝে মাঝে আশে পাশে দু'একটি গাছের ভিতর হইতে পাখীগুলা শাবকদের নিকট নিজেদের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের কাহিনী বিবৃত করিতেছিল; কেহ কেহ বা নিজেদের বাসস্থান লইয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় ঝগড়া করিতেছিল। সেই সুদীর্ঘ লাল কাঁকর-নির্ম্মিত রাস্তাটির উপর আমি একমাত্র পথিক—শান্ত পাদবিক্ষেপে চলিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে পশ্চিম গগনের লালিমাটুকু—মানব-হৃদয়ের শেষ আশার মত নিভিয়া গেল, পাখীরাও কলরব শেষ করিয়া নিজেদের কুলায় মধ্যে আপন আপন আলস্য-বিজড়িত চক্ষুটি সূর্য্যমুখী ফুলের মত মুদ্রিত করিয়া দিল। চারিদিকের সেই মৌন গাম্ভীর্য্যের মধ্যে ঝিঁঝিঁর দল আপনাদের নিশীথ রাগিণী মহা আড়ম্বরে সুরু করিয়া দিল।

পিতা মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার অগাধ সম্পত্তির নির্ব্বিরোধ অধিকারী হইবামাত্র আমি সরস্বতী দেবীর নিকট অকালে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। মাতা ঠাকুরাণী পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গ-পথের যাত্রী হইয়াছিলেন। অভিভাবকশূন্য অবিবাহিত ধনী যুবকেরা যথেচ্ছগামী হয়,—ইহা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমার যথেচ্ছাচার যোষিৎকুলের উন্মাদ প্রেমে বা সুরাদেবীর আকুল উপাসনায় পর্য্যবসিত হয় নাই,—হইয়াছিল কেবল দেশভ্রমণে! সুতরাং পিতৃদেবের মৃত্যুর সাত মাস পরেই আমি ভারত ভ্রমণে বাহির হইলাম। বিহারের দুই চারিটি ভাল ভাল সহর দেখিয়া ও

পাঠান সম্রাট শেরশার প্রথম বিজয়-গরিমান্বিত চুনার ভ্রমণ করিয়া শেষে মৃজাপুরে আসিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, ২।৩ দিনের মধ্যেই দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা সমাপ্ত হইয়াছিল। মৃজাপুরের অনতিদূরে রামভুঁইয়া নামক স্থানে আমার মেসোমশাই কর্ম্ম করেন। এত নিকটে আসিয়া মাসীমা ও মেশোমশাই-য়ের সহিত একবার দেখা না করাটা নিতান্ত অনাত্মীয়তা-পোষক বিবেচনা করিয়া আমার গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ব্যাগটি হাতে করিয়া পদব্রজে রামভুঁইয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম, রামভুঁইয়ায় একটী ছোটখাটো জমিদার আছেন; তাঁহার অধীনে মেসোমশাই দাওয়ানী করেন। শুনিয়াছি, স্থানটি বিহারের অন্যান্য সহরের মত বাঙ্গালীবহুল না হইলেও একেবারে বাঙ্গালী-বিবর্জ্জিত নয়, কসোপলক্ষ্যে মেশোমশায়ের ন্যায় আরো দুই দশ ঘর বাঙ্গালী পরিবার সেখানে বাস করেন। জায়গাটি নাকি বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ ও শান্তিময়।

হোটেলের হিন্দুস্থানী চাকর রামশরণের মুখে শুনিয়াছিলাম, মৃজাপুর সহর হইতে মেশোমশায়ের কর্ম্মস্থল পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান মাত্র। পাঁচ ক্রোশ পথ আমার মত সবল সাহসী নব্য যুবক আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে হাঁটিয়া শেষ করিতে পারিবে মনে ভাবিয়া, স্নানাহারের পর একটু দিবানিদ্রার আরাধনা করিয়া, বেলা তিনটার সময় বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু পশ্চিমের পাঁচ ক্রোশ পথ যে বাঙ্গালীবাবুদের নিকট দশ ক্রোশেরও বেশী,—তাহা তখন পর্য্যন্ত আমার অজ্ঞাত ছিল। ক্রমাগত তিন ঘণ্টা পথ চলিয়া বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম এবং রীতিমত ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল; তবু রামভুঁইয়ার সাক্ষাৎ না পাইয়া, রামশরণের বুদ্ধিলেশবিহীন মস্তিষ্কের উপর ও নিজের চলচ্ছক্তিহীন পদদ্বয়ের উপর অকারণ রাগান্বিত হইলাম। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায় ততদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিলাম—আলোর চিহ্নমাত্র নাই; কেবল উপরে ও নীচে, দূরে ও নিকটে গাঢ় অন্ধকারের কুহক-জাল এবং মাঝে মাঝে দু'একটা জোনাকীর নিষ্প্রভ সচকিত আলোক-কণা! সঙ্গীহীন হইয়া এরূপ নির্জ্জন পথে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক মনে করিয়া চারি ধারে একটা সরাইয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিছুদূর চলিয়া বামপার্শ্বে একটা উঁচু জায়গার উপর একটি ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পাইয়া আশ্রয়ের আশায় অগ্রসর হইলাম। উপরের একটা ক্ষুদ্র জানালা হইতে আলোকের একটু ক্ষীণ রশ্মি আসিয়া চোখে ছুঁচের ন্যায় বিঁধিল; ভাবিলাম—গৃহটি ভগ্ন ও শ্রীহীন হইলেও একেবারে মনুষ্য-পরিত্যক্ত নয়।

বাটীর নিকটে আসিয়া দেখিলাম—বাটীটির প্রথম তলা কালো পাথরে নির্ম্মিত, দোতলাটি ইষ্টকে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। বাটীটির চারিদিকে বহুদিনের আবর্জ্জনা জমিয়া রহিয়াছে, লতাগুল্ম আগাছার বাহুল্য দেখিয়া বোধ হইল—গৃহটি বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল, এখন যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা খুব অল্প দিনই এখানে আসিয়াছে,—সেগুলির উচ্ছেদ করিবার এখনও সময় পায় নাই। দরজার দিকে অগ্রসর হইলাম, কবাটের উপর বেশ বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরে কতকটা অস্পষ্টভাবে লিখিত "লছমন দাসের চটি" —কথাটি অন্ধকারে কোন রকমে পড়িতে সক্ষম হইলাম। দরজায় ঘা দিলাম—এক, দুই, তিন। তবুও ভিতর হইতে কোন উত্তর পাইলাম না। পূর্ব্বাপেক্ষা জোরে আরো দুই তিনটি ঘা মারিলাম, তবুও কেহ দরজা খুলিল না। এমন সময় হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া উপরের ঘরের আলোটি নিবাইয়া দিল, নিকটস্থ একটি বৃক্ষ হইতে একটা কাল পেঁচা বিকট চীৎকার করিয়া বৃক্ষান্তরে উড়িয়া গেল। মনে একটু ভয় হইল; ভাবিলাম—এরূপ ভীষণ স্থানে এ জীর্ণ অট্টালিকাটি পান্থাবাস না প্রেতাবাস?

পুনরায় দরজায় ঘা দিতে যাইতেছি, এমন সময় একটী 'কুপী' বা কেরো-সিনের ল্যাম্প হাতে করিয়া একটি হাস্যমুখী গৌরাঙ্গী বালিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বালিকার পরিধানে হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ থাকিলেও তাহার অঙ্গাবয়ব দেখিয়াই আমি স্থির করিলাম বালিকাটী বাঙ্গালী না হইয়া যায় না। মনে বিষম সন্দেহ হইল—এরূপ ভীতিপ্রদ চটিতে এ বাঙ্গালী-ললনা কে? কিন্তু আমাকে দেখিবামাত্র বালিকার হাস্যরেখা চকিতে মিলাইয়া গেল। বালিকাটী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এখানে কি চান মশাই?' আমি মৃদুস্বরে বলিলাম—"একটু আশ্রয়।"

সুন্দরী গম্ভীরভাবে উত্তর করিল,—"কোন রকমেই আপনি এখানে আশ্রয় পেতে পারেন না। আজকে এ চটিতে দাঁড়াবার স্থান পর্য্যন্ত নেই,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চটি ভর্ত্তি হোয়ে গেছে!

আমি বলিলাম—"আমার কথাবার্ত্তায় বোধ হয় বুঝ্‌তে পাচ্চ—আমি বাঙ্গালী। এ বিদেশে মনে করেছিলুম, একজন বাঙ্গালী রমণীর কাছে একটি রাত্রি যাপন কর্‌বার মত স্থান-ভিক্ষা কল্লে সফল হব। হ্যাঁগা, তুমিই কি এই চটির অধিকারিণী?" বাস্তবিক আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

বালিকা সংক্ষেপে উত্তর করিল—"আমরা বাঙ্গালী নই; আমার পিতা

এখন এ চটির মালিক। আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন; আপনার থাক্‌বার জায়গা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা আপাততঃ দিতে পাচ্চি না।''

বালিকার অঙ্গভঙ্গীতে—কথাবার্ত্তার বিন্যাস-ব্যবহারে আমার মনে হইল, রমণীটি যেন কোন নবন্যাসের নায়িকা। বালিকার নিকট তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে যাইতেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চক্ষু দোতলার পূর্ব্বোক্ত জানালার দিকে পড়িল। নির্ব্বাপিত আলো পুনরায় জ্বলিয়া উঠিয়া ঘরটিকে আলোকিত করিয়াছে; জানালার নিকট একটি বাঙ্গালী যুবকের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, সে যেন মুখ বাড়াইয়া নিবিষ্টচিত্তে আমাদের উভয়ের কথোপকথন শুনিতে ছিল। স্তিমিত আলোকে যতদূর বোঝা গেল, তাহাতে মূর্ত্তিটি আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। একি আমার কলেজের সতীর্থ সেই যমজ ভ্রাতাদ্বয়ের একজন নাকি?

আমি উপরের দিকে চাহিয়া নিঃসংশয়িত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আরে কেও, দত্তজা নাকি?''

জানালা হইতে উত্তর আসিল—"হ্যাঁ আপনি—তুমি কে.....? ওর নাম-কি, নরেন্ নাকি?''

আমি বলিলাম—"তোমার অনুমান মিথ্যা হয় নি। কিন্তু এমে বড় আশ্চর্য্য সংঘটন! সব বল্‌চি, এখন নেমে এস ভাই, যাতে একটু যায়গা পাই তার বন্দোবস্ত কর।''

বন্ধু অনতিবিলম্বে নামিয়া আসিল। দুজনের এরূপ প্রগাঢ় প্রীতি দেখিয়া হোটেল-স্বামীর কন্যা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিতা হইল।

আমি বলিলাম—"ভাই, দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম।.....তারপর মৃজাপুরে নেমে মাসীমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রামভুঁইয়া যাচ্চিলুম; পথে সন্ধ্যা হোয়ে গেল। আশ্রয়ের আশায় ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষে এই ভগ্ন বাটির দরজার সাম্‌নে এসে পড়েচি; কিন্তু এই মেয়েটি বল্‌চে,—আজ সরাইয়ে নাকি তিল পড়্‌বার ঠাঁই নেই! এর কারণ কি হে? এমন ফাঁকা জায়গায় এত লোক—"

দত্তজা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"কোথায় এত লোক? এ বাটিতে আজ আমিই একমাত্র অতিথি,—আর ত কেউ নেই!"

বালিকা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া বলিল—"শীঘ্রই অনেক লোক আস্‌বে ত..... তারা বোধহয় আগে থেকেই ঘর ভাড়া কোরে গেছে।"

"তা সত্ত্বেও একজন লোকের রাত্রি যাপন কর্‌বার মত স্থান এ বাটিতে যথেষ্ট

আছে। এস হে নরেন, ভেতরে এস"—বলিয়া দত্তজা আমার হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। বালিকা দরজা বন্ধ করিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল।

উপরে উঠিতে উঠিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সুধাংশু, তুমি এখানে কি কোরে এলে বল দেখি? হিমাংশু কোথায়? সে এখন কচ্ছে কি?"

"নরেন, এখনও সেই প্রথম পুরোণো ভুল কচ্ছ? আমিই হিমাংশু। দাদা এখন রামভুঁইয়ায়''—

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—"ও ভুল্‌টা, ভাই, প্রকৃতিগত হোয়ে গেছে। যমজ ভাই হোলে নিজেদেরও মুস্কিল, অপরেরও মুস্কিল! তার ওপর তোমাদের দু'ভায়ের মধ্যে একটা তিল, আঁচিল বা জড়ুলের পার্থক্য পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এতক্ষণ তোমাকে সুধাংশু ব'লেই ঠাউরেছি। তার ওপর প্রায় দু'বৎসর হোল্ কলেজ ছেড়েচি, সেই অবধি তোমাদের দুজনকে ত আর দেখিনি। যাহোক্ এখানে কি কর্ত্তে এসেছ শুনি?" এই সময় গৃহস্বামীর মেয়ে আসিয়া আমাকে বলিল,—"আপনাকে বাবা ডাক্‌ছেন, অনুগ্রহ কোরে একবার নীচে আসুন।"

বালিকার সঙ্গে নীচে নামিয়া একটা বড় ঘরে আসিলাম। ঘরের মধ্যে একটা পুরাতন বেতের চেয়ারের উপর গৃহস্বামী বসিয়া আছে। আমি প্রবেশ করিবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে একটা লম্বা সেলাম দিল; আমি সহাস্যে তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া নিকটস্থ একখানা টুলের উপর বসিলাম। লোক-টার মুখের দিকে একবার ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম;—বয়স প্রায় পঞ্চাশের উপর, এক গাদা ঝাকড়া চুল পৃষ্ঠদেশে আসিয়া পড়িয়াছে, কপাল স্বাভাবিক অবস্থায়ই কুঞ্চিত, মুখখানা গাম্ভীর্য্যের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি—হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়, রঙ্ মিশ্ কালো, মস্তকে একটি অনতিবৃহৎ টিকি লম্বমান্, পরণে হিন্দুস্থানী বেশ, চেহারা সাধারণ মনুষ্যকারের চেয়ে কিছু বেশী লম্বা ও হৃষ্ট পুষ্ট; লোক্‌টার কোটরগত বড় বড় চক্ষু এবং ভীষণ চেহারা দেখিয়া প্রথম হইতেই তাহার প্রতি আমার কেমন একটা অশ্রদ্ধা জন্মিল।

লোকটা হিন্দুস্থানী ভাষায় আমায় বলিল,—"আপনাকে দেখে একজন বড় বাঙ্গালী বাবু ব'লে বোধ হচ্চে। আমরা গরীব সকালে এই বাড়ীটি হোটেল করবার জন্যে ভাড়া করেচি মাত্র। আপনাকে আজ যে ভালো খাবার-দাবার দিতে পার্‌ব—এমন আশা হয় না। শোবার জায়গাও তেমন ভালো নেই; ঘর-গুলো এখনও অপরিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে রয়েচে।"

আমি সহাস্যে বলিল—"ভালো খাবারের জন্যে আপনাকে বিশেষ ব্যস্ত হোতে হবে না। ক্ষিধের সময় পেট্‌ভোরে খান্ দুই আধপোড়া রুটি আর একটু অরহর ডাল পেলেই যথেষ্ট হবে।"

ঘরটির চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম,—বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ঘরের চারটী কোন্ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কড়িকাঠগুলির উপর দিয়া মানব-শরীরের শিরা উপশিরার ন্যায় উঁই পোকার লম্বা লম্বা বস্তি নির্ম্মিত হইয়াছে; বরগাগুলির অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট বোধহয়—যেন তাহারা শীঘ্রই পেন্সন্ চায়। ঘরের উপর কোনে দেখিলাম,—মাকড়সার দল নিশ্চিন্ত মনে বহুদিন পরিশ্রম করিয়া এমন ভাবে তাহার ফলোৎপাদন করিয়াছে যে, তাহার নিকট মৎস্যজীবীর জালও যেন পরাজয় মানিয়াছে। বাহিরে দু'একটা চামচিকার দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনের শব্দও শুনিতে পাইলাম; তাছাড়া দুই চারিটা ছুঁচা ইন্দুরের কীর্ত্তনের রেশ যে কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল না—এমন নহে। বাঁটির কর্ত্তাকে বলিলাম,—"এরূপ জনহীন স্থানে আপনার ব্যবসার যে বিশেষ পশার হবে—এরূপ ত বোধ করি না। তা' ছাড়া বাড়ীটির পুনঃসংস্কার কর্‌তেও আপনার অনেক টাকা খরচ পড়্‌বে।"

বৃদ্ধ আমার কথার জবাব দিল না। "লছ্‌মী, শীঘ্র খাবার তৈরী কর; বেশী রাত্রি হোলে বাবুদের বড় কষ্ট হবে"—বলিয়া সে কক্ষত্যাগ করিল। আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা লছ্‌মী, আমাদের ভাষায় এমন পরিষ্কার ভাবে কথা কইতে কোথায় শিখলে? আমিত প্রথমে ভেবেছিলাম—তুমি বাঙ্গালীর মেয়ে!"

লছ্‌মী একটু হাসিয়া এবার নিছক ব্রজবুলিতে বলিল,—"আমি বাঙ্গলা দেশে প্রায় পাঁচ ছয় বছর ছিলুম। কল্‌কাতা সহরে আমার স্বামীর একটা তামাকের দোকান ছিল; বিয়ের পর আমি সেখানেই ছিলাম। তারপর তাঁর মৃত্যুর পর আমি বাবার কাছে চ'লে আসি।.....আমাদের বাড়ী আরা জেলায়।" এই বলিয়া বালিকা ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল।

আমি ভাবিলাম,—যদি সত্য সত্যই এ মেয়েটী কলিকাতায় পাঁচ ছয় বৎসর বাস করিয়া থাকে এবং সত্যসত্যই যদি এ হিন্দুস্থানী হয়, তা সত্ত্বেও এরূপ মার্জ্জিতভাবে বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তার উপর মেয়েটীর আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যেন কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের বাঙ্গালীর মেয়ে;—কথাবার্ত্তার ধরণ-ধারণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী

ছাঁচের। এ মেয়ে বাঙ্গালী না হইয়া যায় না; নিশ্চয় এর মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে। আবার ভাবিলাম—এ বৃদ্ধটিই বা কে? পিতা কন্যার পবিত্র সম্বন্ধ বড় সহজে এ জগতে স্থাপিত হয় না। এর পিতা ত খাস্ হিন্দুস্থানী! এমন একটা কদর্য্য দৈত্যের মত চেহারাবিশিষ্ট চটীওয়ালার এমন সুশ্রী দেবীনিন্দিতা কন্যা? একি সম্ভব? ক্রমশঃ আপনাকে চিন্তা সমুদ্রে গভীর ভাবে ডুবাইয়া ফেলিতেছি দেখিয়া, মনকে প্রবোধ দিলাম,—গোময় পঙ্কে কুবলয়ের জন্ম—নিতান্ত অসম্ভব নয়।

অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে হিমাংশুর ঘরে আসিয়া দেখি, সে এক-দৃষ্টে জানালার বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। কিছু পূর্ব্বে একটা সিগারেট ধরাইয়াছিল, তাহার আগুন তাহার অধর-চুম্বন অভাবে ম্লান হইয়া নিভিয়া গিয়াছে। আমি পিছন হইতে তাহার কাঁধে হাত দিয়া সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিহে ব্যাপার কি? বাইরের দিকে এমন আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েচ কেন? তুমি কি "সুদূরের পিয়াসী" না কোন প্রেমিকার আশাপথ চেয়ে আছ? আমার কাছে এ বাড়ীর সমস্ত ঘটনাই যেন একটা অতল রহস্য ব'লে মনে হচ্চে!"

হিমাংশু নিজের ব্যাকুল ভাব নিমেষে প্রফুল্লতার আবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়া বলিল,—"হ্যাঁ রহস্য আছে বৈকি! চারিদিকে যা' দেখছ—একটা প্রকাণ্ড রোমান্সের উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়!"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাই নাকি? তা'হলে সে Romanceএর নায়ক বোধ হয় তুমি, আর নায়িকা.....এই চটিওয়ালার মেয়ে—লছমী?"

দত্তজা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"নায়িকাটি ঠিক ধর্ত্তে পারনি। লছমীর সঙ্গে প্রেম করা দূরে থাকুক্, তার সঙ্গে বা তার বাপের সঙ্গে আমার পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি; তোমার আস্‌বার ঘণ্টা দেড়েক আগে আমি এই চটিতে আশ্রয় নিয়েচি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন স্বচ্ছন্দে তুমি ত রামভুঁইয়ার তোমার দাদার কাছে যেতে পাত্তে; এমন জঘন্য চটিতে আশ্রয় নেবার ত কোন প্রয়োজন ছিল না।"

"দাদাই আমায় লিখেছিলেন—আজ রাত্রের জন্য এই চটিতে এসে থাক্‌তে!

.....আজ তার সঙ্গে বিষম বোঝা পড়া কত্তে হবে।" এই বলিয়া সে দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল।

"বোঝাপড়া আবার কিসের?...তুমি এতদিন ছিলে কোথায়? কল্‌কাতায় ত তোমায় এতদিন দেখি নি!"

"না ভাই, আমি এতদিন বর্ম্মায় ছিলাম। আমি ভাম্মোয় এবং রেঙ্গুনে সেগুণকাঠের ব্যবসা খুলেচি। মোটে সপ্তাহ খানেক আগে কল্‌কাতায় এসে পঁহুছেছি। দাদার সঙ্গে শীঘ্রই দেখা কর্ত্তে যাব—এই মর্ম্মে একখানা চিঠি তাঁর কাছে লিখেছিলুম; তার উত্তরে তিনি লেখেন, লছ্‌মন্ দাসের চটিতে বাইশে রাত্রে কিম্বা তেইশে সকালে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে, সে জন্যেই এই কদর্য্য চটিতে আমার মত সভ্য বাবুকে এসে বাসা নিতে হয়েচে।"

"তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য হয়েচে নাকি?"

"নিশ্চয়, বেশ গুরুতর রকমের!"

"সহোদর ভাইয়ের মধ্যে এরূপ ঝগড়ার কারণ?"

"নারী"—একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া হিমাংশু উত্তর করিল।

"আশ্চর্য্য?.....তার নামটী কি হে?"

হিমাংশু বলিল,—"তুমি বোধহয় তাকে খুব চেন—সে সুনীলা College Life থেকেই তার সঙ্গে আমার প্রণয়ের সূত্রপাত। তুমি বোধ হয় জান—তার বাপ আলিপুরের একজন Additional magistrate ছিলেন। তিনি যদিও হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তবু ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে তাঁর আন্তরিক টান্ ছিল। আমি তখন ব্রাহ্মসমাজের রবিবারের উপাসনায় নিয়মিত যোগ দিতুম; সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি আমায় তাঁর বাড়ীতে যেতে বল্‌তেন, আমিও যেতুম। ক্রমে ক্রমে সুনীলার সঙ্গে আমার পরিচয়—প্রণয়—পরে প্রগাঢ় প্রেম হোয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সুনীলাও আমায় তার হৃদয়ের একচ্ছত্র অধীশ্বর কল্লে; বলা বাহুল্য সে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে কর্‌বে না,—সে-প্রতিজ্ঞাও কল্লে। কিছুদিন পরে সুনীলার বাবা মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে মৃজাপুরে তিনি একখানা বাড়ী তৈরী করিয়ে যান্। তাঁর মৃত্যুর পর সুনীলাকে নিয়ে তার মা মৃজাপুরে বসবাস কত্তে লাগ্‌লেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমার বাবাও মৃত্যুর বৎসর দুই আগে রামভুঁইয়ায় সাহেবী কেতায় একখানা সুন্দর বাড়ী তৈরী করিয়ে যান্। শুনেচি এখানকার রাজার সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কলেজের ছুটী উপলক্ষ্যে আমি আর দাদা রামভুঁইয়ায় এসে থাক্‌তুম। আমি প্রায়ই

সাইকেলে চড়ে মৃজাপুরে গিয়ে সুনীলাদের দেখে আস্‌তুম। এদিকে দাদা সর্ব্বদা আমার চোখে চোখে রাখ্‌ত,—সুনীলার সঙ্গে আমার ভালবাসা হোয়েচে তা' সে জান্‌তে পেরেছিল। একদিন বৈকালে সুনীলাকে আর আমাকে মৃজাপুরের রাস্তায় একা কোরে বেড়াতে দেখে সে আমায় যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগাল্ দিয়েছিল। তারপর বাবার মৃত্যুর পর দাদার এবং আমার মধ্যে একটা সামান্য কারণে ঘোরতর ঝগড়া হয়, ফলে—উভয়ের মধ্যে বাবার সমস্ত বিষয় ভাগ বখ্‌রা হোয়ে যায়; কপালক্রমে রামভুঁইয়ার বাড়ী খানি আমার হাতে এসে পড়ে। তারপর দাদা চক্রান্ত কোরে অন্য লোকদ্বারা আমার নামে জাল হ্যাণ্ডনোট্ প্রভৃতি সৃষ্টি কোরে তিন চারটা মোকদ্দমা আনায়ন করে। সর্ব্বগ্রাসী মামলায় আমার সম্পত্তির সমস্ত গেল; কেবলমাত্র রইল—কয়েক হাজার নগদ টাকা আর আমার রামভুঁইয়ার বাড়ীখানি। মোকদ্দমা শেষ হবার কিছুদিন পরে—তার মার কাছে আমি তার পাণিপ্রার্থনা কর্‌লাম। মায়ের কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝ্‌লাম,—তিনি প্রকৃত প্রেমিকের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতেচান না; চান্—বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় উপাধির বোঝার সঙ্গে, কিম্বা দিগ্‌গজ মোহরের সিন্ধুকের সঙ্গে। সুতরাং স্থির কর্‌লাম, যতদিন পর্য্যন্ত না পৈত্রিক পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়ে আন্‌তে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত সুনীলাকে আমার অঙ্কভাগিনী করার ক্ষীণতম আশাকেও হৃদয়ে স্থান দেব না।.....তারপর লক্ষ্মীদেবীকে ঘরে বাঁধ্‌বার জন্যে আমি দুটি হাজার টাকা পকেটে নিয়ে একদিন বর্ম্মার উদ্দেশে যাত্রা কর্‌লাম; যা'বারসময় স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ সুনীলা আমায় একটা হীরের আংটি দিয়েছিল, এই দ্যাখ"—এই বলিয়া হিমাংশু আঙ্গুল বাড়াইয়া সেই বহুমূল্য হীরার আংটিটি দেখাইল। এই সময় লছ্‌মী খাবার লইয়া আসিল। আমি ত সর্ব্বাগ্রেই ক্ষুধিত হিংস্রজন্তুর ন্যায় আসনের উপর লম্ফ দিয়া বসিয়া ডাল-রুটিরূপ শীকারের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম। তারপর রুটি চিবাইতে চিবাইতে হিমাংশু বলিতে লাগিল:—

"এই দুই বৎসরের মধ্যে আমি অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে কারবারের মূলধন প্রায় এক লাখ টাকায় উন্নীত করেচি। তাই তাড়াতাড়ি সুনীলার মাকে জিজ্ঞাসা কত্তে আস্‌চি যে তিনি এক লাখ'টাকার অধিকারীর সঙ্গে তাঁর কন্যারত্নের বিনিময় কর্‌তে পার্ব্বেন কি না?.....মৃজাপুরে এসে দেখ্‌লুম—সুনীলাদের বাড়ীতে তালাবন্ধ। এখানকার দুই একজন পরিচিত লোকের মুখে এক মজার কথা শুন্‌লুম যে, আমি নাকি দুই তিন মাস পূর্ব্ব হ'তেই সুনীলা-

দের নিয়ে রামভুঁইয়ার বাস কচ্চি এবং আমার সঙ্গেই সাকি তার বিবাহের সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ হ'য়ে গিয়েছে, এমন কি বেজায় রকম আয়োজনও চল্‌ছে। কিন্তু সুন্‌লে ত—আমি সবেমাত্র হপ্তাখানেক পূর্ব্বে বর্ম্মা থেকে কলিকাতায় ফিরেছি এবং আজ সবে এসে মৃজাপুরে পঁহুছেছি ; সুতরাং এ আমি নয়—দাদা, তার সঙ্গেই বিবাহ ঠিক্ হ'য়ে গিয়েছে।...এখন কিসের বোঝা পড়া বুঝেছ ত ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, তুমি কি মনে কর—সুনীলা তোমার প্রতি এত বিশ্বস্তা আর তোমাকে সে এত ভালবাসে যে, তোমায় ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে কর্‌বে না ?"

হিমাংশু দৃঢ়স্বরে বলিল—"সমস্ত বিশ্বের বিনিময়েও নয়। সুনীলা আমাকে প্রাণের চেয়ে বেশী-ভালবাসে।"

"আচ্ছা, তুমি সুনীলার কাছ থেকে নিশ্চয়ই নিয়মিত চিঠি পত্র পেতে ; শেষ চিঠি কবে পাও বল দেখি ? আর তোমার বাড়ীতে তোমার দাদা বাস করবার অধিকার পেলে কি করে ?"

"প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে আমি সুনীলার শেষ চিঠি পেয়ে ছিলাম। তারপর আমি সু'কে Mirzapurএর ঠিকানায় দুই তিন খানা চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু একখানারও উত্তর পাইনি। প্রায় মাস চার পূর্ব্বে দাদার একখানা চিঠি পাই, তাতে সে আমার ব্যবসার উদ্যমকে খুব প্রশংসা করেছিল, এবং পূর্ব্বের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কত্তে অনুরোধ কোরে, দু'ভায়ের মধ্যে পূর্ব্বকার সদ্ভাব ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা কোরে ছিল। সুনীলার শেষ চিঠি পাবার ঠিক পরেই Mirzapur থেকে দাদার দ্বিতীয় চিঠি পাই। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় প্রায় একমাস যাবৎ তিনি সেখানে এক বন্ধুর বাড়ীতে আছেন ; তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা যেন আমার ফিরে আসা অবধি তিনি রামভুঁইয়ার বাড়ীখানিতে বাস কর্‌বার অনুমতি পান্ ; সংসারের উপর তাঁর বীতরাগ হয়েছে ; আমি ফিরে এলে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে প্রত্যার্পণ কোরে পশ্চিমের এক স্বাস্থ্যকর স্থানে চিরকুমার ভাবে থেকে তাঁর জীবনের বাকী কয়েকটা দিন অনবদ্য স্বচ্ছন্দে কাটাতে চান, ইত্যাদি। বলাবাহুল্য দাদার পত্রের সুরে—তার মতিগতি ফিরেছে বুঝে, আমি পত্রোত্তরে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলুম। কে জানে—সে বিশ্বাসঘাতকতা কোরে সুনীলাদের প্রীতি-অর্জ্জনের সুবিধার জন্যেই আমার বাড়ী খানিতে বাস কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিল!"

"তাহ'লে দেখ্‌তে পাচ্চি—এর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রতারণার জাল বোনা হয়েচে!"

অর্দ্ধচর্ব্বিত রুটি টুক্‌রা পলকে গলাধকরণ করিয়া হিমাংশু স্তোৎসুকে বলিল,—"কি রকম বল ত ? তাহ'লে আমি সহজে দাদাকে ছাড়্‌চি না কিন্তু.....!"

"এ ত বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে,—পূর্ব্ব হ'তেই সুধাংশু সুনীলাকে ভালবাস্‌ত এবং তাকে বিবাহ কর্‌বার আশাও করেছিল। তারপর যখন সে বুঝলে—সুনীলা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে না ভুল্‌তে পাচ্চে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে বিবাহ করার কল্পনা অবিমিশ্র আকাশ কুসুম মাত্র,—তখন বাধ্য হয়ে সে ফন্দীর আশ্রয় গ্রহণ কল্লে। তোমার বর্ম্মা যাবার পর সুধাংশু বোধহয় মৃজাপুরে কোথাও বাস্ কোর্ ছিল ; নচেৎ সুনীলার সঙ্গে পরিচয় এবং তার মা'র সঙ্গে এত ঘনিষ্টতা হওয়া অসম্ভব। আমার ধারণা—যখন তুমি তাকে রামভুঁইয়ার বাড়ীখানিতে বাস কর্‌বার অনুমতি দাও, তখন সে নিশ্চয় সুনীলা এবং তার মা'র কাছে বহুদিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে বোলে মৃজাপুর থেকে গা ঢাকা দেয়। কিন্তু সে নিকটেই কোথাও লুকিয়েছিল, এবং সুনীলার শেষ চিঠি পাওয়ার পর তুমি যে দুই তিনখানা চিঠি তোমার প্রণয়িনীকে লেখ—সেগুলি সে-ই কোন কৌশলে হস্তগত করে।"

"এরূপ করার উদ্দেশ্য ?"

"শোন,—তার পর্ শেষে হঠাৎ একদিন ঠিক তোমার মত চাল্‌চলন্ দোরস্ত কোরে—বেশ ভূষা পরিধান কোরে, সে সুনীলাদের বাড়ীতে এসে নিজেকে বর্ম্মা থেকে সদ্য-প্রত্যাগত হিমাংশু বোলে চালু দিলে। সুনীলা সরলতার পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি—অসংশয়চিত্তে তাই বিশ্বাস কল্লে ; সুধাংশুও অবিকল তোমার মত চাল-চলন ও কথাবার্ত্তায় তাদের বেশ ভুলিয়ে রাখলে। পাছে ভবিষ্যতে তোমার চিঠি সুনীলার হাতে গিয়ে, কোন্‌দিন সুধাংশুর জালিয়াতি ধরা পড়ে যায়, পাছে কোনদিন তুমি নিজে এসে প'ড়ে তার প্রণয়ের রসভঙ্গ ক'রে দাও, পাছে কোনগতিকে সুনীলা তাকে সুধাংশু বোলে সন্দেহ করে, সেইজন্যে সে কোন রকমে সুনীলা আর তার মা'কে রাজী কোরে, তাদের রামভুঁইয়ার বাড়ীতে নিয়ে গেচে.....।"

হিমাংশু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত চক্ষু বিস্ফারিত—দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ করিয়া বলিল,—"এতদূর ষড়যন্ত্র!"

আমি বলিতে লাগিলাম—"খুব সম্ভব তাই। তুমি কল্‌কাতায় দাদার সঙ্গে

সাক্ষাৎ প্রার্থনা কোরে যে চিঠি লেখ, তার উত্তরে দাদা তোমাকে এই সরাইয়ে এসে সাক্ষাৎ কত্তে বলেচে,—কেন বুঝেচ ত?—যাতে কোন রকমে সুনীলা আর তোমার মধ্যে সাক্ষাৎ হোয়ে তা'র সমস্ত চালাকী ফাঁক না হোয়ে যায়। সুধাংশু এখন তোমার সু'কে বিবাহ কত্তে মরিয়া হোয়ে উঠেচে। হতভাগিনী সুনীলা এখনও সুধাংশুকে ভ্রম কোরে"—

এমন সময় আমার চক্ষু হঠাৎ দরজার দিকে পড়িল, দেখিলাম—লছ্‌মী নিস্তব্ধে দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ উৎসুক হইয়া আমাদের কথোপকথন শুনিতেছে; কতক্ষণ সে সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল বলিতে পারি না, যেইমাত্র আমার ঈষৎ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি তাহার আগ্রহমাখা চক্ষুর উপর পতিত হইল, অমনি তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, সে ত্বরিৎপদে পানের ডিবাটী বিছানার উপর রাখিয়া অবনত মস্তকে নীচে নামিয়া গেল।

তারপর আমি পুনরায় বলিলাম, "এখন বুঝ্‌তে পাচ্চ হিমু, কেন তোমার দাদা তোমার কাছে বাড়ীখানি চেয়েছিল এবং কেনই বা তোমায় রামভুঁইয়ায় যেতে না বোলে এখানে তার সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাক্‌তে লিখেছে? সে বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা কোরে হয়—ক্ষমা চাইবে, নয়—সুনীলার আশা পরিত্যাগ কর্‌বার জন্যে তোমাকে অনুনয় বিনয় কর্‌বে।"

হিমাংশু অর্দ্ধোন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল,—"Impossible দুটির একটীও কত্তে আমি সম্মত নয়।...Stupidটাকে আমি খুন কর্‌ব।"

"ছিঃ পাগলের মত কথাবার্ত্তা ব'লো না।"

হিমাংশু একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "কল্‌কাতায় পঁহুছে সুনীলাকে চিঠি না লিখে আমি বড় বোকামি করেচি।"...আহার শেষ হইল। আমি আচমন করিতে করিতে বলিলাম, "লিখেও কোন ফল হোত না, তোমার দাদা সেখানি কৌশলক্রমে হস্তগত কত্তেন। আর তা না কল্লেও চিঠি সুনীলা পেত না; কারণ, তুমি ত লিখ্‌তে মুজাপুরে ঠিকানায়, কিন্তু তারা আজ আড়াই মাস যাবৎ বাস কচ্চে রামভুঁইয়ায়।

আমি একটা সিগারেট ধরাইলাম; হিমাংশু পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "আমি এখনই রামভুঁইয়ায় রওনা হব। গিয়ে সুনীলাকে সমস্ত ঘটনা ভেঙ্গে বল্‌ব, দাদার সমস্ত কারসাজী তাহ'লে প্রকাশ হোয়ে পড়্‌বে।"

"না হে না, আজ্‌কে রামভুঁইয়ায় গেলে তুমি হয়ত একটা গুরুতর রকমের কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌বে। বচসা কোত্তে কোত্তে উত্তেজিত হোয়ে হয়ত তুমি তোমার

দাদাকে হত্যা কর্‌বে, নয় তোমার দাদাই তোমাকে হত্যা কর্‌বে। তার ওপর এত রাত্রে এমন জায়গায় তুমি ঘোড়া কিম্বা একা পাচ্চনা, সুতরাং রামভুঁইয়ায় যাবার আগেই নিশ্চয় তুমি হিংস্র জন্তুর উদরে কিম্বা চোর ডাকাতের ফাঁপরে প'ড়ে প্রাণ হারাবে।"

হিমাংশু কিছুক্ষণ ভাবিল; তারপর ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, কাল সকাল পর্য্যন্ত বড় জোর অপেক্ষা কর্‌ব; দাদার সঙ্গে দেখা হয় ভালো, নচেৎ সরাসরি রামভুঁইয়ায় গিয়ে এ জুয়াচুরী ব্যাপারের একটা চরম মীমাংসা কোরে ফেল্‌ব।"

আমি ইতোমধ্যে দুই চার বার হাই তুলিয়াছিলাম; হিমাংশুকে বলিলাম,—"আজ রাত্রে আর তোমার দাদা আস্‌চে না, নিশ্চয়। আজ্‌কে বেশ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও, কাল সকালে উঠে দু'জনে মিলে এক সঙ্গে রামভুঁইয়ায় যাওয়া যাবে—বুঝ্‌লে? তোমাদের এ রহস্যপূর্ণ ব্যাপারের শেষ chapter না দেখে আমিও ছাড়্‌চি না।"

হিমাংশু রাজী হইল। আমি তাহার কক্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বলিলাম, "হিমু, দেখো যেন ভাল কোরে দরজা দিতে ভুলো না, একটু দেখে শুনে খিল এঁটো আর একটু সজাগ হ'য়ে ঘুমিও।" হিমাংশু লণ্ঠনের আলো কমাইতে কমাইতে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন তুমি কি মনে কর, দাদা আমাকে cold blooded murder কর্‌বার জন্যে রাত্রি বারোটার পর রামভুঁইয়া থেকে এখানে আস্‌বে?"

আমি নিম্ন কণ্ঠে বলিলাম, "যে লোক চক্রান্ত কোরে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজিয়ে তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত কত্তে পারে, যে তোমার প্রণয়িনীকে নীচ কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিবাহ কর্‌বার চেষ্টা কত্তে পারে, তারপক্ষে তোমার গলায় ছুরী বসান বড় অসম্ভব কাজ নয়। তা ছাড়া এই অপূর্ব্ব ধরণের হোটেলওয়ালাটি বা তার ফুট্‌ফুটে মেয়ে লছ্‌মীকেও আমার বড় বিশ্বাস হয় না। তোমার হাতে আবার Valuable diamond ring—"

হিমু—"আচ্ছা good night" বলিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি আমার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অপরিচ্ছন্ন কক্ষখানিতে আসিয়া, অপরিষ্কৃত বিছানার উপর নিজের অবসন্ন দেহখানিকে পূর্ণভাবে লম্বিত করিয়া, পরম পেলব পদ্মনাভের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

'হাঁ' ও 'না'।

বাঙ্গালীর বাড়ীতে ভোজের পংক্তি থেকে যে একটা মিশ্রিত ধ্বনি উত্থিত হয় সেটা বোধ হয় সকলেই শুনেছেন। "হাঁ হাঁ দেয়ং, হুঁ হুঁ দেয়ং, ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে।" এই উদ্ভট রকমের রসাত্মক বাক্যটিতে কোনও অজ্ঞাতনামা কবি কেমন সুন্দরভাবে খাঁটি স্বদেশীপদ্ধতিবিশেষ বর্ণন করেছেন! কথাটা একটু তলিয়ে বুঝলে দেখা যায় যে, মানুষ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে জগৎটাকে জুড়ে রয়েছে। হাঁর দল ভয়ানক পেটুক, তারা দিন-রাত কেবলি চাইছে। হুঁর দল একটু লাজুক, তাদের পেটে ক্ষিদে আছে, হাঁটাকে একটু সঙ্কুচিত ক'রে নিয়েছে মাত্র। নার দলের ক্ষিদে নাই কেমন পেট ভ'রে গেছে। হাঁ তমোগুণসম্পন্ন; তার ভাল মন্দ সবই চাই। হুঁ দেখে শুনে, বিচার ক'রে খায়, তার ভেতর রজোগুণের প্রাধান্য আছে। না সাত্ত্বিক, ত্যাগের দিকে তার মতি-গতি। বিধাতার সৃষ্টিতে ও মানুষের কারখানায় এই তিন শ্রেণীর জন্য খাদ্য ও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। সাড়ে বত্রিশ ভাজা, চানাচুর, ঘুঘ্‌নিদানা থেকে আরম্ভ ক'রে কাবুলের ফল, বিলাতের মদ, মার্কিনের চুরুট, সকল প্রকার দেশী ও বিদেশী খাদ্য-অখাদ্য হাঁর চাই। গাড়ী ঘোড়া মোটর উড়ো-জাহাজ দস্তানা পাগড়ি টুপি ব্যাগ রুমাল এসেন্স ছড়ি ঘড়ী হাঁ ধার ক'রে কিনবে, এর জন্যে তাকে দেউলে হ'তে বা জেলে যেতে হয় তাতেও সে রাজী। হুঁ দরকারি জিনিষ যাচাই ক'রে কেনে। তবে, সুবিধা পেলে হুঁও কিছু ছাড়ে না। হাঁ ও হুঁ দুই সহোদর যমজ, তাদের মধ্যে যে সামান্য একটুখানি আড়াল আছে সেটা মাঝে মাঝে উঠে যায়। না জগৎ-ছাড়া লোক, সে এক সন্ধ্যা, আধ-মুঠো খেতে পেলেই সন্তুষ্ট। হুঁ শ্রেণীর কথা ছেড়ে দিয়ে হাঁ ও নার তত্ত্ব আলোচনা করলে জানা যায় যে, হাঁ-হুঁর দল ভোগী, নার দল ত্যাগী। ভোগীর সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশী, ত্যাগীর সংখ্যা খুব কম। নার উৎপত্তি প্রাচ্যে, তার গতি-বিধি নিবৃত্তির রাস্তায়। হাঁর জন্ম পাশ্চাত্যে, তার চলা-ফেরা প্রবৃত্তির সদর সড়কে। নার গায়ে ছাই-ভস্ম, হাতে চিমটে-কমণ্ডলু, মাথায় জটা। হাঁর গায়ে সাতপুরু কাপড়, হাতে

আংটি লাঠি রিষ্ট-ঘড়ি, মাথায় বাবরি-চুল টেরি টুপি। হাঁ দেশের একদিক থেকে আর একদিক পর্য্যন্ত ছুটো-ছুটি করছে, তার রসনায় তৃপ্তি নাই, মনে শান্তি নাই। না নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট, সে দৌড়-ধাপ ভালবাসে না।

হাঁ ও না একটা জিনিষের দুইটি অবস্থা মাত্র। ছেলেবেলায় যখন হৃদয় মন মস্তিষ্ক চোখ কাণ নাক পেট একটু একটু ক'রে ফুটে উঠে, তখন 'চাই চাই' শব্দে আমাদের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেই অস্থির হয়ে পড়ে। এই যে পরের কাছে হাত-পাতা অভ্যাসটা ছেলেবেলায় আরম্ভ হয় সেটা অধিকাংশ লোকের বুড়ো বয়সেও থেকে যায়। তবে, খুব বেশী বয়েসে মানুষের দেহ যখন কম-জোর হয়ে পড়ে, হজম-শক্তি যখন নির্ব্বাণপ্রায়, তখন ডাক্তারের পরামর্শ শুনে নার অভ্যাস ধরতে হয়। যদি বৃদ্ধ বয়সে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে তা হ'লে কোনও কালে লোকে ভুলেও 'না' বলে না। কেবল বয়েসের সঙ্গে বিচারশক্তি বেড়ে উঠে মানুষকে কতকগুলো জিনিষের দিকে সাবধান হ'তে বলে দেয়। যে সাবধান হয় তার জীবনের বাতিটা খানিকক্ষণ বেশী জ্বলে আর যে সাবধান না হয় তার প্রদীপের আলো দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠে শীঘ্র নিভে যায়। মানুষের স্বাভাবিক গোঁ কিন্তু হাঁর দিকে, অবস্থাবিশেষে হাঁ না হয় মাত্র। গোড়া থেকেই নার পক্ষপাতী হয়েছে এমন লোকের নাম জানি না। যদি কেহ থাকে তাহ'লে সে পাগল আর না হয় ভণ্ড। অনেকে আবার স্বপক্ষ ছাড়তে চায় না। ছেলে ভাই ভাইপো ভাগনে এরা গুরুজনের হাঁ দেখে হাঁ করে, 'না' বলে। মনিব যা বলবে চাকর তাই বলবে। "পৃথিবীতে নিজে ভেবে নিতে পারে এমন লোক কয়জন আছে?"

শব্দ শাস্ত্র বলে, দুটো না মিলে একটা হাঁ হয়। এই ডবল-না হুঁর সামিল। দু'মুখো সাপের মত ইহা অত্যন্ত কপট ও ডিপ্লোমাট্। তবে, স্বাভাবিক নিয়মে নার গতি অস্থির দিকে হ'লে বুঝবে যে, নার ভেতর থেকে একটা প্রকাণ্ড হাঁ বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। একটুখানি না বা ছোট একটু হাঁ অনেক সময়ে উল্টো বুঝায়। খাঁটি না ও হাঁ জগতে বিরল। গান্ধীর মত না-বাদী যিনি কিছুই চা'ন না ও রবীন্দ্রের মত হাঁ-বাদী যাঁর সব ভাল জিনিষ চাই, এমন লোক কয়জন মেলে? এরা সামনা-সামনি শত্রুতা করে, পেছন থেকে অন্ধকারে লুকিয়ে ছুরি মারে না। কপট না ও ডিপ্লোমাটিক হাঁ বাইরে এক-রকম দেখায়, কিন্তু তাদের ভেতরটা অন্য রকমের। এই শ্রেণীর না সুবিধা পেলেই হাঁ করবে, বেশী কিছু দক্ষিণা, বরপণ জোগাড় হ'লে পেট্রিয়টিজম কৌলিন্য

শপথ অঙ্গীকার ভুলে যাবে। রাজনৈতিক জগতে যত দালাল গোয়েন্দা মোসাহেব আছে তারা এই শ্রেণীর লোক। এদের জীবনের উদ্দেশ্য, মত, চাল-চলন, কথাবার্ত্তা আজ একরকম, কাল অন্যরকম, তার পরদিন আর এক রকম। এই লোকগুলিকে দেখেই বোধ হয় শান্তিরাম বলেছিল, "যে হয়কে নয় করে, তাকে দেখে ভয় করে।" এরা অপ্রিয় সত্য বলতে চায় না। দেশে যখন চারিদিকে আগুন জ্বলছে এরাই গর্ত্তের ভেতর তখন লুকিয়ে পড়ে!

খাঁটি হাঁ ও না দুজনেই আইডিয়ার দাস, স্বপ্ন-রাজ্যের লোক। নার প্রকৃতি গম্ভীর, সে রচা কথা জানে না; হাঁ যুক্তি তর্ক জানে, বক্তৃতা করে, প্রবন্ধ লেখে। না ঘর-বাড়ী দেশ ছেড়ে পরীর দেশেও যেতে নারাজ। সে নিজের একটুখানি মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। হাঁ নিজের ঘর-বাড়ী দেশ ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজনকে ভুলে পরের সঙ্গে মিশতে চায়। নিতুই নূতন হাঁর ঈপ্সিত। হাঁ আলট্রা-লিবারল্, না হাড়ে-হাড়ে কনজারভেটিব; না চরকা কাটবে, মোটা কাপড় পরবে, তাতে লোকে তাকে অসভ্য বলে, বলুক। হাঁ কলের মানুষ, তাই সে কলে প্রস্তুত জিনিষের পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য ইকনমিকস্ হাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার মন ভোগেচ্ছা দৃঢ় ক'রে গেঁথে দিতে চায়। না বলে, বৈরাগ্য অবলম্বন কর, ভোগের দিকে চেয়ে দেখো না। হাঁর ইচ্ছা এই যে, সকলে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করুক আর তার ফলে সমাজে বিলাসিতা বেড়ে উঠুক। না বলে, এ জগতে দরিদ্রের সংখ্যা এত বেশী যে বিলাসিতাকে বহন করা উচিত। তার মতে বুঝে সুঝে চললে খুব সুখ না পেলেও খুব দুঃখও পাবে না। হাঁর দলে বড় মানুষ জনকয়েক মাত্র, গরীবের সংখ্যাই অধিক। না দলে গরীব কম, গেরস্ত খুব বেশী, বড় মানুষ কম! হাঁ ও নার চারিদিকে সমাজতন্ত্র গজিয়ে উঠে আপাততঃ সাধারণ লোকের মনে একটা থম্ থমে ভাবের সৃষ্টি ক'রেছে। মাঝে থেকে সংসারটা উৎসন্নের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

রাজনৈতিক ভোজের আসরে ছদ্মবেশী হাঁ ও নার চীৎকার সারা দেশটাকে মাতিয়ে তুলেছে। হাঁর দল দিন রাত ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে চাইছে। "টাকা দাও, আইন দাও, চাকরি দাও।" এরাই ষোল-আনা একষ্ট্রিমিষ্ট। হুঁর দল সামান্য যা কিছু পায় তাতেই তাদের আনন্দ। এরা যথার্থ মডারেট্। নার দল ঘরে ব'সে হাঁ ও হুঁকে গালাগালি করছে। কর্ম্মকর্ত্তার নিজের সাধ্যমত ভোজের আয়োজন ক'রে সকলকেই পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পত্রের পাদটীকায় সেই দরকারি কথাটা লেখা ছিল,—"লৌকিকতা লইতে অক্ষম।"

নার দল নিমন্ত্রণ নিলে না। হাঁ-হুঁরা এখন দক্ষিণ হস্তের সদ্ব্যবহার করছেন। খাদ্যের তালিকা বড়ই জাঁকাল রকমের। রিফর্ম-খিচুড়ী, ইলেকসন-ছ্যাঁচড়া, স্বাধীনতার ধোঁকা, প্রভার মুড়ীঘণ্ট, বাগবাজারের রসগোল্লা ইত্যাদি ইত্যাদি। দুষ্ট লোকে বলে বঙ্গমাতার শ্রাদ্ধ হচ্চে। বাস্তবিক তা নয়। ইষ্ট-ওয়েষ্টের শুভ-পরিণয় উপলক্ষে এই ভোজের ব্যবস্থা নিমন্ত্রণপত্রের খামের একধারে ছাপা ছিল,—

"উষার বিয়ে মুশার সাথে।
ঘটক ঠাকুর ভানু যাতে॥"

প্রত্যেক খাদ্যটি রিফর্মড্ মিউনিসিপ্যালিটির মার্কা-করা বিশুদ্ধ পবিত্র ঘৃতে প্রস্তুত। কর্ম্মকর্ত্তার স্বরভঙ্গ হওয়াতে এক্ষণে তিনি পর্দ্দার অন্তরালে বিশ্রাম করছেন। তিনি উপযুক্ত লোকজন মোতায়েন করে দিয়েছেন, কার্য্য বেশ শৃঙ্খলার সহিত চলছে। প্রাচ্য মতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে। 'দীয়তাম্,' 'ভুজ্যতাম্' শব্দে ভোজনাগার ভরপুর। পাথেয় ও দক্ষিণার বন্দোবস্ত আছে। বর ও কন্যাপক্ষের পুরোহিতগণ চৌষট্টি হাজার হিসাবে পাবেন!

পাড়ার জনকয়েক নিষ্কর্ম্মা জমা হয়ে মাঝে মাঝে গ্রামভাঁটি চাইছে আর তাতে ক'রে বড়ই গণ্ডগোল আরম্ভ হচ্ছে। তারা চীৎকার ক'রে বলছে, স্কুল কলেজ পাঠশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে টাকা দাও। গ্রামের এই লোকগুলোর কিছুমাত্র আক্কেল নাই। তারা পূর্ব্বাপর কার্য্যের চিরকেলে বিধি ভুলে গিয়েছে। আগে গুরুপুরোহিত বিদায়, তারপর দলপতিদিগকে রজত-মর্য্যাদা দান, তৎপরে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের জলযোগ, তার পর বড়লোকদের সহিস কোচম্যান্ চাকর বেহারাদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ, শেষে ঢুলী পাইক প্রভৃতিকে আহার করাইয়া গভীর রাত্রে বিশ্রাম। পরদিবস যখন বর ক'নে দোলায় চ'ড়ে বিবাহ-বাড়ী থেকে বিদায় লইবার জন্য অপেক্ষা করবে তখন ত গ্রাম-ভাঁটির কথা উঠিবার উপযুক্ত সময়। সকল কার্য্যেই ধারাবাহিকতা আছে। এদেশের কতকগুলো লোক এসব বুঝে না; আগে গৃহস্থের মান রক্ষা করা দরকার, না গ্রামভাঁটির জন্যে নূতন কুটুম্বদেরকে বিরক্ত করা উচিত? এত বড় বিরাট ভোজে যদিও কোন ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যাদের হাতে ভাঁড়ার তারা খুব পাকা লোক, তবু সামান্য গ্রামভাঁটির জন্যে আজ থেকে কথা কাটা-কাটি আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয় না।

ভাঁড়ারীদের সুবিবেচনায় কেহ যে অভুক্ত থাকিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। তারা ত নিজে ছহাতে খাচ্চে আর জানালার ফাঁক দিয়ে ভাই ভাইপো ছেলে জামাই বেরাই বন্ধু-বান্ধবকে সরা ভ'রে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন রাবড়ী প্রভৃতি পার ক'রে দিচ্ছে। তারা সরাগুলি নিয়ে গিয়ে যে যেখানে সুবিধা দেখছে সেইখানে ব'সে আছে। কেহ এজলাসের উপরে, কেহ দপ্তরখানায়, কেহ বা অন্য কোথাও ব'সে গেছে। দেশের যত ভিখারি এদিকে বিয়ে বাড়ীর বাইরে রাস্তায় ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এরা সব চাষা ভুষো, মুটে-মজুর, মেথর মুর্দ্দফরাস প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোক। এত ভিখারী জমা হ'য়েছে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে বুঝি বা এদেশের শতকরা ৯৫ জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা সকলের খাওয়া শেষ হ'লে পাতের এঁটো কাঁটা পেলেও দু'হাত তুলে আনন্দে নাচতে থাকবে। বাবুদের খাওয়া কখন যে শেষ হবে কে জানে? যাই হোক্, এমন সমারোহ ব্যাপার কেহ কখন দেখে নি। বিয়ের পর হনি-মুন্ দার্জ্জিলিংয়ে আরম্ভ ও শেষ হবে। নার দল বোকামি ক'রে ঘরে ব'সে রইল, তারা ঠ'কে গেল।

নিমচাঁদ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীত বিষয়ে দুই একটী কথা।

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীত বিষয়ে যে প্রবন্ধ 'মাসিক বসুমতী'র পৌষ সংখ্যায় লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতৃভক্তি ও কবি-ভক্তিতে সন্তুষ্ট ও প্রীত হইলাম। প্রবন্ধের কোনও কোনও অংশ দৃষ্টান্তাভাবে ভাল বুঝা যায় না, ভরসা করি দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার বক্তব্যটি ভাল করিয়া স্ফুট করিয়া তুলিবেন।

উক্ত প্রবন্ধ-পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, শ্রীমান্ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে পাশ্চাত্য সঙ্গীত হইতে উচ্চতম তাহা স্বীকার করেন, তবে কেবল বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এই যে গম্ভীর বা করুণ মধুর রস, এটা আমার কাছে আমাদের সঙ্গীত-বিকাশের একটা মস্ত সম্পদ বলে

মনে করি। সমস্ত ললিত কলারই প্রাণ নির্ভর করে তার বৈচিত্র্যের উপর, এবং এই বৈচিত্র্য মানে হচ্ছে উচ্চতম সুরের আর্টের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত একটু নিম্নস্তরের আর্টের একত্র সম্মিলন।" আর বলিয়াছেন, "শুধু সঙ্গীতের মধুরতম ও উচ্চতম বিকাশকে নিয়ে ঘর করা চলে না যেহেতু বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই এই উচ্চতম সুরের সঙ্গীত-মাধুর্য্য ফুটে উঠে থাকে।" উপরোক্ত দুইটী বাক্যে অর্থবিপ্রতিপত্তি দোষ থাকা সত্ত্বেও ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, উচ্চতর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বৈচিত্র্য আছে, ইহা লেখক বিশ্বাস করেন। তবে আর পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নিকট ঋণী হইবার আবশ্যকতা কি? আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কত প্রকার বৈচিত্র্য আছে তাহার সংখ্যা নাই, এক একটী রাগিণী, গমক, তান, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি যোগে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। যে গায়ক যতটুকু সাধনা করিয়াছেন তিনি ততটুকু বৈচিত্র্য দর্শাইতে পারিবেন। দুইজন গায়ক কি বাদক বৈচিত্র্য দ্বারা একই রাগ আলাপ করিলে দেখিতে পাইবেন, একজন এক ঘণ্টা বা ততোধিক কাল (অবশ্য একঘেয়ে ভাবে না করিয়া) আলাপ করিতে পারেন, আর একজন কষ্টে ১০।১৫ বা ২০ মিনিট পারিবেন। ইহা বৈচিত্র্যের অভাব নয়, সাধনার অভাব। এতদ্ভিন্ন লয়, তান, বাঁট ইত্যাদির দ্বারাও নানা-রূপ বৈচিত্র্য দেখাইতে হয়। একই রাগ ধ্রুপদে, খেয়ালে, টপ্পায় গান কর—কত বৈচিত্র্য পাইবে; আবার একই রাগ ধ্রুপদে ধ্রুপদ অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন তালে ও লয়ে গান করিলে বৈচিত্র্য পাইবে। সেইরূপ খেয়ালে, টপ্পা ইত্যাদিতেও পাইবে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই—উহাকে ওস্তাদেরা প্রচলিত ভাষায় "উপদাইশ" বলে।

প্রবন্ধের আর একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমাদের সঙ্গীতের উচ্চতম বিকাশকে অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিতে আমরা বাধ্য হলেও আমরা যেরকম ভাবে এযাবৎ সুধু করুণরসাত্মক (যেমন খেয়াল, গজল, ঠুংরী প্রভৃতি) বা শান্তরসাত্মক (যেমন ধ্রুপদ) প্রভৃতি সঙ্গীত নিয়েই ব্যস্ত আছি, সেরকম ভাবে সুধু এই দুই একটী মাত্র রসের বিকাশকে নিয়েই মাথা ঘামালে চলবে না অর্থাৎ আমাদের সঙ্গীতে উল্লাস ও হর্ষরসাত্মক সুরেরও আমদানী দরকার।" উপরোক্ত কথায়ও বেশ বুঝা যায় যে, শ্রীমানের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি বেশ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। কেবল রসের বাহুল্য খুঁজিয়া পান নাই, তাই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে চান। এইখানে রসের অদ্বিতীয় কবি ৺মাইকেল মধুসূদনের বিলাপ মনে পড়িল। তিনি লিখিয়াছেন—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিধির রতন,
তা' সবে অবোধ আমি, অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশ, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;—
ফেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,
"ওরে বাছা গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই! যারে ফিরে ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপে খনি, পূর্ণ মণি-জালে।"

তাই বলিতে হয়, এই সুবৃহৎ সঙ্গীতশাস্ত্র খুঁজিয়া লইলে ঘরেই রসের অভাব নাই বুঝিতে পারিবেন। কমল ফেলিয়া শৈবালের আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই। উল্লাস বা হর্ষরস হাস্যরসের অন্তর্গত। আর্য্য ঋষিরা দুই একটী রস লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই। তাঁহারা প্রকৃতিদেবীর ভাণ্ডার খুঁজিয়া আদি, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত আর শান্ত—এই নয়টী রস পাইয়াছেন, যেমন সমস্ত স্বর ধ্বন্যাত্মক নাদের অন্তর্গত, সেইরূপ যত রস সমস্ত এই নয়টী রসের অন্তর্গত। শাস্ত্রে প্রত্যেক রসের স্বরলিপিসহ গান আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা দিলাম না। যদি আবশ্যক হয় দিতে পারিব। কে বলিয়াছে ধ্রুপদ শান্তরসাত্মক আর খেয়াল, গজল, ঠুংরী করুণরসাত্মক? কেন ধ্রুপদে কি করুণ রস নাই, না খেয়ালে শান্তরস নাই? ধ্রুপদ, খেয়াল, গজল, ঠুংরী তালও ছন্দবোধক সংজ্ঞা; ধ্রুপদে, খেয়ালে সব রসই পাইবে।

"এঁরা অর্থাৎ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও মদীয় পিতৃদেব যে বর্ত্তমান সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আনন্দ ও নূতন রসের প্রেরণা আমাদের বহন ক'রে এনে দিয়েছেন, একথা নিতান্ত কাঁচা ওস্তাদি সঙ্গীতের ভক্ত ছাড়া আর কেহই অস্বীকার কর্ত্তে পার্ব্বেন না। ওস্তাদি সঙ্গীতের দাম ও সৌন্দর্য্য, অবশ্য এদের কথিত সঙ্গীতের চেয়ে বেশী, কিন্তু তাই ব'লে এই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সঙ্গীতকে অভিনন্দন না করার

কোনই কারণ নেই।" এই উক্তিতেও বিপ্রতিপত্তি দোষ আর অযথা অকুতোসাহস নিহিত আছে, সেটা অধিকাংশ কৃতবিদ্য লোকের সঙ্গীতানভিজ্ঞতার জন্য। যখন লেখক ওস্তাদি সঙ্গীতের মূল্য ও সৌন্দর্য্য অধিক বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন বর্ত্তমান আমদানী-সঙ্গীতকে সুধু কাঁচা ওস্তাদী সঙ্গীতের ভক্ত কেন পাকা ওস্তাদী সঙ্গীতের ভক্তও অভিনন্দন দিবেন না। যাঁহারা অভিনন্দন দেন তাঁহাদিগকে আমি দোষ দিই না, যাহার যতটুকু দৌড় সে ততটুকুই ভালবাসে। তাহার দৃষ্টান্ত কীর্ত্তন, মাড়, গজল, পাহাড়ী গান, কাবুলীদের গান; খোট্টাদের গান, ভাগলপুরী অঞ্চলের গান, সাঁওতালিগান ইত্যাদি। শাস্ত্রকার এ সবও ছাড়েন নাই। গান দুই প্রকার মার্গী ও দেশী। এই সকল গানকে দেশী সঙ্গীতের অন্তর্গত বলেন। দেশ, রুচিভেদ বিশেষ মাত্র।

লেখকের পিতৃদেব একবার লেখকের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বন্ধুবরের ভাগলপুরস্থ বাটীতে আসিয়াছিলেন। এক ঘটনায় আমার বন্ধুবর আমায় ডাকিয়াছিলেন। আমি উপস্থিত হইয়া দেখি অনেক উকিল, হাকিমের সমাবেশ হইয়াছে, রায় মহাশয় কমিক ইত্যাদি গান করিতেছেন। সকলেই তাহা শুনিয়া আধুনিক আনন্দসূচক Nice, Bravo ইত্যাদি ধ্বনি করিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে হাততালিও দিতেছিলেন। পরে তিনি আমার পরম বন্ধু ৺উপেন্দ্রনাথ বাগচীর অনুরোধে একটী ওস্তাদি ধরণের আশাবরী গান করিলেন। রায় মহাশয় সুকণ্ঠ ছিলেন, বলিতে কি উপস্থিত সকলেই স্বর-মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

স্বরমুগ্ধ কথাটা আমি এইজন্য বলিতেছি,—কারণ আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, দুই একজন ছাড়া কেহই গানের কথা অর্থাৎ শব্দার্থ বুঝেন নাই; অথচ কেবল স্বরবিন্যাস ইত্যাদিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই কথায় আমি ইহা বলিতে চাহি না যে,গানের রচনা-মাধুর্য্য শ্রোতাকে নিশ্চয় মুগ্ধ করে। তবে একথা বলিতে হয় যে, গানের রচয়িতা যদি সুগায়ক ও তালজ্ঞ না হন,তাহা হইলে তাঁহার গান-বাঁধা কবিত্বমাত্র, রাগের রস নষ্ট করা ছাড়া ভাবোন্মত্ততা আনিতে পারিবে না। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বা রায় মহাশয়ের গানে যাহা উল্লাস বা হর্ষরস আনিয়া দেয় তাহা যদি বর্ণাত্মক না হইয়া কেবল ধ্বন্যাত্মক মাত্র হয় অর্থাৎ যদি গান না করিয়া কেবলমাত্র কোন যন্ত্রে বাজান হয়, তাহা হইলে হর্ষ বা উল্লাস রস আনিতে পারিবে কি?

৪। "Traditionএর প্রতি শ্রদ্ধার বিনাশ" করিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আমার মতে যুক্তিযুক্ত হয় নাই। য়ুরোপেও traditionএর প্রতি ভক্তি

আছে। Carlyleএর "Hero worshlp" যদি কল্পনা করা যায় এবং যদি বলা যায় আমাদের পুরা-কাহিনী নাই তাহা হইলে আমাদের অস্তিত্ব নাই, স্বয়ম্ভু হইয়া পড়িব। যদি tradition ত্যাগের ফলে য়ুরোপীয় সঙ্গীতে harmonyর প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহা হইলে harmonyর প্রবেশে প্রতীচ্য সঙ্গীতের যে দশা হইয়াছে তাহা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত Helmholtyর কথায় বুঝিতে পারিবেন। তিনি বলেন :—

"Music has hitherto withdrawn itself from scientific treatment more than any other art. Poetry, Painting and Sculpture borrow at least the materials to their delineation from the world of experience. They portray nature and man.....In music on the other hand, it seems at first sight as if those were still in right who reject all anatomisation of pleasurable sensation. The art borrowing no part of it material from the experience of our senses, not attempting to describe and only exceptionally to unitate the outer world, necessarily withdrawn from scientific considerations. The chief points of attack which other arts present and seems to be as comprehensible and wonderful as it is certainly powerful in its effect."

"Raussean another eminent scientist is of opinion that Music is not really improved by harmony."

উক্ত মন্তব্য শ্রীমান্‌ও একপ্রকারে স্বীকার করিয়াছেন—"মানুষের মন পুরাতনের বা অভ্যস্তের খোঁজেই চল্‌তে ভালবাসে ব'লে তাকে নতুনে সাড়া দেওয়াতে হয় জোর করে।" জোর করে কেন? বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে কি জোর খাটে? Is sentiment over reason? আরও বলা হইয়াছে, "আর্টে এই সনাতন নিয়ম-কানুনকে পূজা করার বা একরোখা ভাবে মেনে চলবার প্রবৃত্তি নব সৃষ্টির পথে যে একটা মস্ত বাধা একথা আমরা ভুলে গিয়েছি। তার প্রমাণ এই গত কয়েক শতাব্দী মধ্যে নতুন রচনা আমাদের মোটেই সৃষ্ট হয়নি, আর য়ুরোপে শত শত সঙ্গীত-রচয়িতা নিত্যই নূতন স্বর-বিন্যাসের উদ্ভাবনা ক'রে মানুষকে নিত্য নূতন আনন্দ দিচ্ছেন।" শ্রীমান্ বোধ হয় আমাদের সঙ্গীতের কোন খবর রাখেন না। কে বলিয়াছে যে, গত কয়েক শতাব্দীতে সঙ্গীতের নূতন রচনা হয় নাই? তানসেনী, দরবারী কানেড়া, মিয়া মল্লার, দরবারী তোড়ী, মিয়া সারঙ্গ এগুলি কি? সুরদাস সুরমল্লার, বৈজুবাওয়া রাজবিজয়, নায়ক গোপাল নায়কী কানেড়া, বাহাদুর সাহ বাহাদুরী তোড়ী, রামদাসরামদাসী মল্লার, আমির খুসরু সাহানা, সফর্দ্দা সাজগিরি ইত্যাদি অনেকে মিশ্র রাগরাগিণী রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে, যথা—হরিদাস স্বামী, রাজামান, মিয়াবক্স, মিরাবাঈ, লক্ষ্মণ দাস, গন্ধর্ব্ব সেন, সদারঙ্গ, সোবি, রামপ্রসাদ, ওয়াজিদ আলি সাহ ইত্যাদি।

প্রবন্ধের একস্থানে আছে—"কেউ যদি কোনও পুরাতন রাগ-রাগিণীর নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহ'লে তাঁর রচনার সমালোচনা করার সময় আমাদের কেবল এইটুকু মাত্র ভেবে দেখলেই চলবে যে, তাতে আনন্দ পাওয়া যায় কি না, এবং যদি যায়, তার পরিমাণ কতখানি ও তার স্থায়িত্বই বা কতটুকু। সঙ্গীতের তারিফে এই আলোচনাই সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়া উচিত। তাই কোন্ নূতন সুরের বিন্যাস বা নূতন সঙ্গীতের ধারায় আমরা যদি কোন রস পাই, তবে তাতে যদি মাডাগাস্কর বা হনোলুলুর সঙ্গীতের আমেজ থাকে ত থাক না কেন; তাতে কি যায় আসে?" ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। কোন্ রাগে এবং কোন গানে তালের মাডাগাস্কর বা হনোলোলুর সঙ্গীতের আমেজ সুন্দর শ্রুতি মধুর হইবে, স্বরলিপি সহ দৃষ্টান্ত দিলে আমিও বুঝিব এবং অনেকে বুঝিতে পারিবেন—কি যায় আসে।

প্রবন্ধের আর একস্থানে আছে,—"আমার মনে হয় যে, আমাদের উচ্চতম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মধ্যে এতখানি সত্য সম্পদ্ আছে ও এতখানি সত্যরস আছে যে, শীঘ্র তার আনন্দসঞ্চারের ক্ষমতা নতুনের আগমনে লোপ পাবে না। পক্ষান্তরে যদি নূতন কোন ঢেউয়ের বা তথ্যের আলোকে আমাদের এ সনাতন সঙ্গীতের অঙ্গহানি হয়, তবে সে অঙ্গহানিকেই আমি অভিনন্দন করিব; কারণ নতুন সত্যের আলোকে যে বর্ণ ম্লান হয়ে যায়, তার দামই বা কি আর গৌরবই বা কতটুকু? সেরূপ স্বল্পপ্রাণ রসকে নিয়ে কোলে করে ব'সে থেকে লাভই বা কি? কিন্তু আমাদের মধ্যে সঙ্গীতরসিকমাত্রেই উচ্চতর সঙ্গীতে এতখানি রস পেয়ে থাকেন যে, এ সঙ্গীতের মধ্যে রসের বিদ্যমানতা ধ্রুব বলে মনে করার ঢের কারণ আছে"।—শ্রীমানের হিন্দু সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া বাস্তবিক আনন্দ হয়।

শ্রীমান্ যতটুকু ব্যুৎপত্তি প্রতীচ্য সঙ্গীতে লাভ করিয়া আসিয়াছেন, ভরসা করি আমাদের সঙ্গীতে তাহা লাভ করিলে উপস্থিত মত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। তখন বুঝিতে পারিবেন যে, এক কলসী গো-দুগ্ধে একবিন্দু গো-মূত্র পড়িলে কি হয়। শ্রীমানের জ্যেষ্ঠ তাত বাবু হরেন্দ্রলাল রায় বন্ধুবরের নিকট শুনিয়া সুখী হইলাম যে, শ্রীমান্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন।

প্রবন্ধের শেষে Wagner, Beethoven প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোকের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস আছে যে, সঙ্গীত একটা সখ মাত্র যেমন দাবা খেলা বা ঘোড়দৌড় দেখা, সঙ্গীতের সঙ্গে মানুষের মনের বিকাশের যে কতদূর সম্বন্ধ আছে, তার কোনও খবরই আমরা সচরাচর রাখিনে। আমাদের সঙ্গীত অশিক্ষিত লোকের হাতে পড়ে এতদিন রয়েছে বলেই আমাদের এ রকম একটা ধারণা জন্মেছে, ফলে আরও হইয়াছে এই যে, আমাদের দেশে সঙ্গীতবিদ্ লোক মোটের উপর যদি অবজ্ঞার পাত্র না হন, তা হ'লে উদাসীন্যের পাত্র ত নিশ্চয়ই। কিন্তু উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতের উচ্চতম বিকাশের যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তা য়ুরোপে Wagner, Beethoven প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারগণ কি রকম cultured লোক ছিলেন, তার একটু পরিচয় পেলে অনেকটা উপলব্ধি করা যায়।" আমাদের মধ্যে উচ্চতম সঙ্গীতজ্ঞ লোকের বিশ্বাস তাহা নয়, তাঁহারা সঙ্গীতকে দাবাখেলা বা ঘোড়দৌড় দেখা মনে করেন না। শাস্ত্রের উক্তি এই :—

"ত্রিবর্গা ফলদা সর্ব্বে দামাদীতি জপাদয়।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥
জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যান কোটি গুণো লয়।
লয় কোটীগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥

সঙ্গীতকে অনেকে কেবলমাত্র বিলাসের সামগ্রী মনে করেন। সঙ্গীত অনেক সময় বিলাসিতার অঙ্গ হইয়া থাকে তাহা সত্য, কিন্তু তাহা প্রকৃত পক্ষে সঙ্গীতের একমাত্র ধর্ম্ম নহে। দুগ্ধ-পানে শিশুর জীবন রক্ষা হয়; যোগী দুগ্ধ পান করেন যোগ-সাধনের জন্য, ভোগীর দুগ্ধ-পান ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য, দুষ্ট লোক দুগ্ধ পান করে পশুবৃত্তি চরিতার্থের জন্য, দুগ্ধ-পানে বলবানের বল বৃদ্ধি হয়, দুগ্ধ-পানে সর্পের বিষকোষ পূর্ণ হয়, এজন্য দুগ্ধ দোষবাচ্য হইতে পারে না, সঙ্গীতের পক্ষেও সেই কথা। তামসিক-প্রকৃতিসঙ্গীতকে

আপন ভাবে টানিয়া আনে। সঙ্গীত যোগীর প্রাণায়ামযোগ। তুমি পরিশ্রমশীল, সঙ্গীত তোমার শ্রম-বিনোদের সহায়, তুমি যুদ্ধবীর, সঙ্গীত তোমায় রণোন্মত্ততার উত্তেজক, তুমি সুখপরায়ণ ধনিসন্তান, সঙ্গীত তোমার কাল-হরণের পরম সহায়। সকল ভাবে, সকল অবস্থায় সঙ্গীতের অধিকার আছে বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রে বলে, "সঙ্গীত ভাবসমুদ্রের পবন-হিল্লোল"। প্রেম বল, প্রণয় বল, স্নেহ বল, বিরহ বল, শোক বল, নৈরাশ্য বল, সঙ্গীতেই সুন্দর ফোটে। সঙ্গীত দুর্দ্দমনীয় মনকে মোহিত ও বশীভূত করিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য নাশ করে। প্রীতির প্রবাহ স্বতই অন্তরাভিমুখে অবিচ্ছেদে ধাবিত হয়। তাই মহাযোগী মহেশ্বর সঙ্গীতের সাধক। মহর্ষি নারদ হরিনাম-গানে বিভোর এবং আর্য্য ঋষিগণ সাম-গানে দেবতার উপাসনা করিতেন। ইহারই জন্যই সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎপত্তি। প্রাচীন ঋষিগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও, একালের সাধক হৃদয়ে সঙ্গীত অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই; জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, তুলসী দাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ প্রাণের উচ্ছ্বাস সঙ্গীতে গাঁথিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে উপহার দিয়াছেন, আবার সেদিন চৈতন্যদেব জ্ঞানের কঠিন শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া প্রেমের প্লাবনে ভারত ভাসাইয়াছিলেন। সেইদিনও তিনি সঙ্গীতের প্রাণোন্মাদিনী শক্তির সহায়তা লইয়া কোটী কোটী প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগাইয়াছিলেন। সঙ্গীত মুমুক্ষুর পক্ষে মুক্তির সোপান। "গানাৎ পরতরং নহি" এই মহাবাক্য সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে। তাই বলি, আমাদের সঙ্গীতের উদ্দেশ্য মহৎ; "দাবা খেলা বা ঘোড়-দৌড় দেখার" ন্যায় সখের জিনিস নয়। "মানুষের মনের বিকাশের সঙ্গে যে কত গভীর সম্বন্ধ আছে" তাহা জানে। সচরাচর লোকে তাহা না জানিতে পারে।

৮। আমাদের সঙ্গীত অশিক্ষিত লোকের হাতে পড়িয়া এতদিন আছে বলিয়া তাহার অঙ্গহানি হয় নাই। সঙ্গীতানভিজ্ঞ শিক্ষিত লোকের হাতে থাকিলে আজ তানসেন, নায়ক গোপাল, বৈজু বাওরা ইত্যাদি মহৎ লোকের নাম লোপ পাইয়া যাইত তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অধুনা সঙ্গীতের যে দুর্দ্দশা হইতেছে দেখিলেই বুঝা যায়।

৯। Wagner বা Beethoven মানুষ হিসাবে যে উচ্চদরের লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা বলিয়া তানসেন প্রভৃতি যে অসৎ লোক ছিলেন বা উপস্থিত ওস্তাদরা যে অসৎ লোক তাহা নয়। যাঁহারা আমাদের

উচ্চদরের সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা সচ্চরিত্র না হইলে উচ্চ সঙ্গীত শিখিতে কদাচ পারিতেন না। আমাদের সঙ্গীত যেরূপ শ্রেষ্ঠ তাহার সাধনাও সেইরূপ কঠিন। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি ও চরিত্রের পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। শ্বাসকে দীর্ঘস্থায়ী করা আবশ্যক, ইন্দ্রিয়সকলকে দমন করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্থির করিতে হয়। সুগায়ক সংযতেন্দ্রিয় যোগী। উচ্চসঙ্গীতশিক্ষা এক হিসাবে যোগ-শিক্ষা। দুই দশটী গান করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিলেই গায়ক হয় না। গায়কের চরিত্রদোষ লক্ষ্য করিয়া আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রের পবিত্রতায় কলঙ্ক আরোপ করিলে অবিচার হয়।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী

(২)

অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,—কান্যকুব্জাদি পবিত্র-দেশাগত বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের পরিচালনায় বঙ্গদেশ ধর্ম্মকর্ম্মে ও সদাচারে সমুন্নতি লাভ করিয়াছিল। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কান্যকুব্জ হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণাগমনের পূর্ব্বে এদেশে ব্রাহ্মণ ছিল না, অথবা যাহারা ছিল, তাহারা নিতান্তই আচারভ্রষ্ট হীনপ্রভ ব্রহ্মবন্ধুকল্প ছিল, এমত বুঝিলে বড়ই ভুল করা হইবে। কারণ,—স্মরণাতীত কাল হইতেই বঙ্গদেশে যে বৈদিক ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠ ছিল, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণের অভাব নাই।

বঙ্গে বেদবিভাগ।

চরণব্যূহ পরিশিষ্টের ভাষ্য-পাঠে জানা যায় যে, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কানীন ও গুর্জর এই কয়টি দেশে যজুর্ব্বেদীয় "মাধ্যন্দিনী" শাখা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।—

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাশ্চ কানীনো গুর্জরস্তথা।
বাজসনেয়ী শাখা চ মাধ্যন্দিনী প্রতিষ্ঠিতা॥"

বিভিন্ন প্রদেশে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অর্থ হইতে জানা যায় যে, পরাশর

সগোত্র কৌৎসগোত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট হইতে বিশিষ্ট সম্মানসূচক ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* বলা বাহুল্য যে, ঘৃতকৌশিক-গোত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্তর্গত নহেন। অদ্যাপি বাঙ্গালায় ঘৃত-কৌশিক-পরাশর-কৌণ্ডিল্য-গৌতম-মৌদগল্য গোত্র প্রভৃতি সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত নহেন। কিন্তু অধুনা "পাঁচগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ওর বেশী বামন নাই" এই ছড়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পঞ্চগোত্রাতিরিক্ত ব্রাহ্মণের বৈদিকতা অনুমিত হইয়া থাকে। এই অনুমান যে একেবারেই ভিত্তিহীন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ গ্রামীন শব্দের অপভ্রংস "গাঁই" শব্দ যে কেবল রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাদৃশ সিদ্ধান্তের অনুকূল কোনও প্রমাণ নাই।

প্রত্যুত মদন পালদেবের তাম্রশাসনে চম্পাহিট্টি গ্রাম বাস্তব্য কৌৎস সগোত্র বটেশ্বর স্বামিশর্ম্মার গাঁই-প্রতিপাদক "চম্পাহিট্টীয়" বিশ্লেষণ দেখা যায়।

"কৌৎস সগোত্রায় শাণ্ডিল্যাসিত দেবলপ্রবরায় পণ্ডিত শ্রীভূষণ সব্রহ্মচারিণে সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়িনে "চম্পাহিট্টীয়ায়" চম্পাহিট্টীয় বাস্তব্যায় বৎস-স্বামি প্রপৌত্রায় প্রজাপতি স্বামিপৌত্রায় শৌনকস্বামি পুত্রায় পণ্ডিত ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বামী শর্ম্মণে..." গৌড়লেখমালা ১৫৪ ও পৃ।

পরাশর গোত্র-প্রভৃতি ব্রাহ্মণই যে বাঙ্গালার পুরাতন অধিবাসী, তাহাতে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকেই যজু-র্ব্বেদী, বঙ্গে যজুর প্রভাব পূর্ব্ব প্রদর্শিত চরণব্যূহ-পরিশিষ্টের প্রমাণানুসারে বঙ্গদেশ যজুর্ব্বেদেরই প্রচারভূমি। বাঙ্গালার বিভিন্ন পদ্ধতিতে অদ্যাপি যজুর্ব্বেদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গে যজুর প্রভাব।

প্রায় প্রত্যেক পদ্ধতিতেই সঙ্কল্পবাক্যের পর পাঠ্য সঙ্কল্পসূক্তের প্রতীক প্রদর্শনস্থলে "ওঁ দেবোবোদ্রবিণোদা ইত্যনেন সূক্তেন..." ... "ভজ্জাগ্রতেতি পঠিত্বা" এই লিপিবিন্যাসের দ্বারা যজুর্ব্বেদীয় সূক্তেরই উল্লেখ দেখা যায়।

কিন্তু এখানে অবশ্য বক্তব্য যে, যজুর্ব্বেদের প্রভাব-সত্ত্বও অন্যবেদীয়ের অভাব মনে করাও ভুল করা হইবে। কারণ মদন পালদেবের তাম্রশাসনে

---

* প্রথম মহীপালের তাম্রশাসনে পরাশর সগোত্র যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় শাখাধ্যায়ী মীমাংসা ব্যাকরণ তর্ক বিদ্যাবিৎ কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। গৌড়লেখমালা ৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সামবেদের কৌথুমশাখাধ্যায়ী কৌৎস সগোত্র ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব তুর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাঙ্গালাতে ব্রতনিয়ম স্ত্রী-আচার কুলাচার প্রভৃতি এতই বিভিন্ন যে, দেশান্তরাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরদিগের সহস্রাধিক বৎসর-ব্যাপক অবস্থানের দ্বারাও তাহার গঠন সম্ভবপর হয় না। ইহাতে নিতান্তই স্মরণাতীত কালের পুরাতন বঙ্গাধিবাসীর মৌলিকতা রহিয়াছে। দেশান্তরাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ ক্রমে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরূপে পরিণত হইয়া তত্তৎপ্রদেশ-প্রসিদ্ধ আচার নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতেই পৌরাণিক ব্রতনিয়মাদির প্রাদেশিকতা রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বিভিন্নাকারে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালার আদিম ব্রাহ্মণের প্রভাব।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই দুই জাতি পশ্চিম দেশ হইতে আগত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্যান্য সভ্য জাতিই বাঙ্গালার প্রাচীন অধিবাসীদিগের সন্ততি।

বাঙ্গালার একটি বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, উত্তম, অধম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যেসকল জাতি বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আর্য্যশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ, এবং অনেকের মধ্যে অদ্যাপি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জাতীয় ব্যবসায়ের কথঞ্চিৎ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি নটজাতি গীতবাদ্য করিয়া থাকে, কর্ম্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, সূত্রধার, নাপিত শঙ্খবণিক বারুজীবী রজক প্রভৃতি জাতির মধ্যে জাতীয় ব্যবসায়ের বিলোপ হয় নাই।

আর একটী বিশেষ বক্তব্য যে, ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে এখনও খাঁটী বৈশ্য জাতি আছে। ভাওয়ালে এবং পাবনা-ঘাট সহরেও এই আসল বৈশ্যজাতির অস্তিত্ব রহিয়াছে। ময়মনসিংহের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে এবং কুমিল্লায় সাবেক আমলের ক্ষত্রিয় বর্ম্মণ-জাতি আছে। ইঁহাদের কখনও সংস্কার-বিলোপ হয় নাই। কিন্তু ইহাদের মধ্যে আর অধুনা জাতীয় ব্যবসায়ের অস্তিত্ব নাই।

বাঙ্গালার যাবতীয় জাতি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবে বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে, সুতরাং এই পর্ব্ব এখানেই উপসংহৃত হইল।

বাঙ্গালার অপর একটী বিশেষ গৌরবের বিষয় পাতিব্রত্যের মর্য্যাদা। উচ্চ হইতে নীচ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতির সমাজেই পাতিব্রত্যধর্ম্মের সমাদর ও ব্যভিচারের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু বলিয়া পরিচিত কোনও বাঙ্গালী

জাতিই ব্যভিচারোৎপন্ন কোন ব্যক্তিকে জাতসারে সমাজে প্রবিষ্ট হইতে দেয় না।

অধুনা যাহা বাঙ্গালা নামে পরিচিত, পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ বঙ্গদেশের সহিত উহার অভিন্নতা নাই। পূর্ব্ববঙ্গের কিয়দংশ পরমার্থতঃ পুরাণ শাস্ত্রানুমোদিত বঙ্গদেশ। কামরূপের কিয়দংশ, পুণ্ড্রদেশ, গৌড়দেশ প্রভৃতি বিস্তৃত ভূভাগ এখন বঙ্গনামে ও বাঙ্গালা নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গ ও বাঙ্গালা।

মৈথিল গ্রন্থকার এবং পশ্চিমদেশীয় অন্যান্য-নিবন্ধকারগণ মিথিলার পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্য সমাজকেই "গৌড়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া "গৌড়াস্তু" এইরূপ লিপিভঙ্গীর দ্বারা গৌড়ীয় মতের প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, কোন মুনির অথবা পুরাণের নামনির্দ্দেশ না করিয়াই মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র "তথাচ গৌড়ীয়া স্মৃতিঃ" বলিয়া গৌড়দেশ-প্রচলিত স্মৃতিবচনের প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল কারণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রাঢ় গৌড় প্রভৃতি অবান্তরভেদ সত্ত্বেও আধুনিক বাঙ্গালা স্মরণাতীত কাল হইতেই গৌড়সমাখ্যা লাভ করিয়াছিল। পুরাণ-শাস্ত্রে গৌড়দেশবাসীর জন্য স্বতন্ত্র ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা দেখা যায়। অগস্ত্য-মুনির উদ্দেশে ভাদ্রমাসের শেষে অর্ঘ্যদানের অনুষ্ঠান গৌড়দেশবাসীর নিজস্ব ধর্ম্ম।

"অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং শেষভূতে স্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অর্ঘ্যং দদ্যুরগস্ত্যায় গৌড়দেশ নিবাসিনঃ॥"
(মলমাসতত্ত্বে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

বাঙ্গালার বিভিন্নদেশেই উক্ত অর্ঘ্যদান-সম্বন্ধ অগস্ত্যব্রতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে অগস্ত্যব্রতের অদ্যাপি বিশেষ প্রচলন আছে। কিন্তু খাঁটি গৌড়দেশে অগস্ত্যের সমাদর এখন লুপ্তপ্রায়। কুমিল্লাতে অগস্ত্যের ব্রত বুড়াবুড়ীর ব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ত্রিকাণ্ড-শেষকার পুরুষোত্তমের মতে পুণ্ড্রদেশের অপর নাম বরেন্দ্রী। উহা গৌড়দেশের অন্তর্গত। "অথপুণ্ড্রাঃস্যুর্ব্বরেন্দ্রী গৌড়নাবৃতি।" ফুল্লুক ভট্টও আত্মপরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে স্বকীয় জন্মভূমি বরেন্দ্রীকে গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গৌড় ও বরেন্দ্রী।

"গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে।" অভিধান চিন্তামণিকার আচার্য্য হেমচন্দ্রের মতে বঙ্গদেশের অপর নাম "হরিকেলীয়" "বঙ্গাস্তু-হরিকেলীয়াঃ"; স্থানান্তরে বঙ্গদেশের হরিকেলক নামও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশীয়ের এই নামটি বিশেষ শৌর্য্য-ব্যঞ্জক বলিয়া প্রতিভাত হয়। হরি—সিংহ তাহার ন্যায় কেলী—ক্রীড়া যাহারা প্রাপ্ত হয়, ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ হইতে যেন উহাই মনে হয়। কিন্তু গৌড়দেশের মত বঙ্গের স্বাতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। সাহিত্যে গৌড়ের রীতি স্বতন্ত্র। আচার নিয়ম স্মার্ত্তশাসন অনেকাংশেই স্বতন্ত্র। হিন্দুর ধনাধিকার-নির্ণয়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই মিতাক্ষরার অপ্রতিহত প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় জীমূতবাহনের দায়ভগাই ধনাধিকার-নির্ণায়ক। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও বাঙ্গালার বিভিন্ন-যুগের বিভিন্নস্তরে রচিত বাঙ্গালীর গ্রন্থই সমতীত স্বকীয় সমাজ-শাসনের বিশিষ্টতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গৌড়ীয় গ্রন্থের সমালোচনা অন্যত্র করা হইবে, সুতরাং এখানে তাহা উপেক্ষিত হইল। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, পদ্ধতি-রচনায় ও যুক্তিপ্রদর্শনে বাঙ্গালীর মত কৃতিত্ব অন্য কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

এখানে বলা আবশ্যক যে, গৌড়ীয় স্মৃতি-শাসনের অধীন সমাজ-নিবিষ্ট মানবগণই বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে স্মৃতি-শাসনের বহির্গত বাঙ্গালাবাসীও বাঙ্গালী নামে পরিচিত হইতেছে।

পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণে আসিয়া গৌড়ীয় সমাজে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের সংশ্রবে পশ্চিমদেশের রীতি-নীতিও কতকটা বাঙ্গালী সমাজে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান একেবারেই জানিতেন না, তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে পারিত না; অতএব রাজা দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, এই কল্পনাও ভিত্তিহীন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশ যজুর্ব্বেদের প্রচারভূমি ইহাতে যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণগণই স্মরণাতীত কাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যজ্ঞবিশেষে চতুর্ব্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। অদ্যাপি এই প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং যজুর্ব্বেদাতিরিক্ত ব্রাহ্মণের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় অথবা অন্য কোনও অপরিজ্ঞাত কারণে হয়ত দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই মিথিলা দেশ বাঙ্গালীর গুরুস্থানরূপে পরিচিত।

এই গুরু-শিষ্যভাব যে কেবল ন্যায়শাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, স্মার্ত্ত মতও মৈথিল গুরুর নিকট হইতে বাঙ্গালী গ্রহণ করিতেন। বাঙ্গালীর নিবন্ধ-গ্রন্থে অনেক স্থলেই মৈথিল মত অনুসৃত হইয়াছে। গৌড়ীয় ও মৈথিল নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ইদানীন্তন বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান, ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলেই গৌড়ের ও মৈথিলের সামঞ্জস্য দেখা যায়। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান যে কাহার নিজস্ব তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। হয়ত অনাদি কাল হইতে উভয় দেশেই আচরিত হইয়া আসিতেছে। অনেক স্থলে বিষয়ের ঐক্য সত্ত্বেও পরিপাটীর পার্থক্য দেখা যায়।

এ স্থলে একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।—বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই ভাই ফোঁটার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বাঙ্গালী রঘুনন্দনের গ্রন্থে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃত্য লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ভগিনীর হস্তান্নভক্ষণের আবশ্যকতা ও অন্নদানে ভগিনী কর্ত্তৃক পাঠ্য মন্ত্র লিখিত হইয়াছে। ভগিনীকে দান দিবার ব্যবস্থা আছে। যম, চিত্রগুপ্ত ও যমুনা—এই তিনের পূজার বিধান আছে। ভগিনী ও ভ্রাতা উভয় কর্ত্তৃক যমের উদ্দেশে অর্ঘ্যদানের ও প্রণামের মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ফোঁটা দিবার কোনও কথা নাই। মেয়েরা নানাস্থানে নানারূপ বাঙ্গালা মন্ত্র পাঠ করিয়া ভ্রাতার কপালে ফোঁটা দিয়া থাকেন।

ভাই ফোঁটা।

কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের কৃত্যচিন্তামণিগ্রন্থে ফোঁটার বিধান ও প্রাতঃকালে গন্ধ তাম্বুল পুষ্পের দ্বারা ভ্রাতৃ-নিমন্ত্রণের প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—

"ভ্রাতৃভালেচ তিলকং প্রদদ্যাদ্ভগিনী শুভা।
দত্ত্বাবদদে যম-দ্বারে ময়া দত্তং হি কণ্টকম্॥
গন্ধতাম্বুল পুষ্পাদ্যৈঃ প্রাতর্ভাতৃ নিমন্ত্রণম্।"
মিতি বিষ্ণু পুরাণীয়ম্।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে যমের দ্বারপাল-মহিষসূর্য্য-সংজ্ঞা প্রভৃতিরও পূজার বিধান আছে। বাঙ্গালায় ফোঁটা দান, ভ্রাতৃ-নিমন্ত্রণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে মৈথিল মতেরই সমন্বয় দেখা যায়। কিন্তু উহা কাহার নিজস্ব, অথবা উভয় দেশবাসীর সাধারণ, তাহার বিনির্গমক কোনও হেতু দেখা যায় না।

এই ফোঁটা-ব্যাপারে বাঙ্গালার বিভিন্ন-বিভাগোপবিভাগে প্রভূত আচার

ভেদ দেখা যায়। কিন্তু অধুনা কোঁটাদান ও ভ্রাতাকে অন্নদানে মন্ত্রপাঠ ব্যতীত অন্য অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

সন্দেহ-ভঞ্জন।

(১)

"এক রাজা ছিলেন। তাঁর দুই রাণী—সুয়োরাণী, আর দুয়োরাণী। তিনি সুয়োরাণীকে খুব ভালবাস্‌তেন, আর দুয়োরাণীকে দুর ছাই কর্‌তেন। রাজা দিগ্‌বিজয়ে বেরোবেন; সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্—হাতী, ঘোড়া, রথ লোকজন সব প্রস্তুত। এমন সময় তিনি সুয়োরাণীর ঘরে প্রবেশ কর্‌লেন। সুয়োরাণী বালিসে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল। রাজা তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে কত আদর ক'রে বল্‌লেন 'ভয় কি রাণী, আমি শীগ্‌গির ফিরে আস্‌ব—তোমার জন্যে কত কি আন্‌ব'—

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম 'কি ইন্দু, বুঝ্‌তে পারবে?'

সে উত্তর কর্‌ল, "হাঁ, তারপর!"

ইন্দু ৭ বছরের বালিকা—আমার পালিত কন্যা। ইহসংসারে আপনার বল্‌তে তার আর কেউ ছিল না। সে যখন আট দিনের মেয়ে তখন তার মা ও মাতামহের এক সঙ্গে মৃত্যু হয়। তার বাবা বহুপূর্ব্বেই সংসার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী সুহাসিনী ইন্দুকে নিজের পেটের মেয়ের মত ভালবাস্‌ত; আমাদের ও পর্য্যন্ত কোন পুত্র-কন্যা হয়নি—ইন্দুই ছিল আমাদের একমাত্র স্নেহের আকর্ষণ। আমি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি ততক্ষণ তাকে চোখের আড়াল করিনি—সেও আমার কাছ থেকে নড়্‌তে চায় না। বাস্তবিক সে আমার সমস্ত হৃদয়টাকে দখল ক'রে বসেচে।

সেদিন বিকাল বেলা আকাশ কেমন ঘোর করে এসেছিল। বৃষ্টি নাম্‌ব নাম্‌ব হয়েছিল। একটু সকাল সকাল কোর্ট থেকে বাড়ী ফির্‌লুম।

গাড়ী থেকে যেমন নেমেচি অমনি ইন্দু কোথা থেকে এসে আমার হাত ধরে' নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমাকে পড়্‌বার ঘরে টেনে নিয়ে গেল এবং ধরে' বস্‌ল—তখনই তাকে রাজারাণীর গল্প শোনাতে হবে। আমিও অমনি কোর্টের পোষাক না ছেড়ে তাকে গল্প শোনাতে বসে গেলুম।

আমার স্ত্রী হঠাৎ সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্‌ল, "কিরে ইন্দু, গল্প শুন্‌তে বসে গেলি। উনি এই সমস্ত দিনের পর এলেন—"ওঁকে কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখে হাতে জল দিতে দে—তার পর গল্প শুনিস্‌খন।' এই কথা শুনেই ইন্দু সে ঘর থেকে চলে' যাবার উপক্রম কর্‌ল। আমি বল্‌লুম, 'না ইন্দু, তোমায় যেতে হবে না—গল্পটা আগে শেষ করে ফেলি।' কিন্তু ইন্দু 'রাতে শুন্‌ব' এই বলেই আবার নাচ্‌তে নাচ্‌তে স্থানান্তরে চলে গেল।

আমার স্ত্রী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল, "আচ্ছা ইন্দুর ওপর তোমার এতটা টান কেন? আপনার ছেলে মেয়েকেও যে লোক অতটা ভালবাসে না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত রহস্য আছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লে তুমি কিছুই বল না,—আমার মাথা খাও—আমায় সত্যি বল, আসল ব্যাপারখানা কি?"

আমি বল্‌লুম "লক্ষ্মীটী আমার কিছু নয়। আচ্ছা, সুহাসিনী তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?' সুহাসিনী উত্তর কর্‌ল, "আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি! আমি কি তোমায় চিনিনি! তবে আমার মনের মধ্যে কেমন একটু"—এই বলেই সে তাড়াতাড়ি জলখাবার আন্‌তে চলে গেল। আমিও কাপড়-চোপড় ছাড়্‌তে লাগ্‌লুম।

কিছুক্ষণ পরে সুহাসিনী একখানি রেকাবিতে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন এনে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল, "এ গুলি খান্ মশায়"! আমি বল্‌লুম "ইন্দু কোথা, তাকে ডেকে দাও!"—আমি ইন্দু ইন্দু বলে ডাক্‌তে লাগলুম। সুহাসিনী—"আমি তাকে এইমাত্র খেতে দিয়ে আস্‌ছি—এগুলি তুমি নিজে খাও।"

আমি তবুও ইন্দুর জন্যে কিছু রেখে দিলুম। সুহাসিনী পানের ডিবাটী সম্মুখে রেখে দিয়ে বল্‌ল—"চাকরকে তামাক দিতে বলি।"

আমি সুহাসিনীকে বল্‌লুম, "আচ্ছা যখন তোমার ইন্দু সম্বন্ধে রহস্য জান্‌বার জন্য এত আগ্রহ তখন আজ রাতে তোমায় সমস্ত বল্‌ব।"

সুহাসিনী মৃদু হেসে বল্‌ল, "ভয় নাই, আমি রাগ কর্‌ব না।"

(২)

আমার একজন মক্কেল এসেছিলেন—তাঁকে বিদায় দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে

যখন শয়ন-কক্ষে গেলুম তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। সুহাসিনী তখন' পর্য্যন্ত গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও ঘরের অনেক কাজই সুহাসিনী নিজের হাতে কর্‌ত। আমি কক্ষে প্রবেশ করে' দেখলুম বালিকা ইন্দু প্রফুল্ল-কমলকোরকবৎ অকাতরে নিদ্রা যাচ্চে, বাতায়ন দিয়ে চন্দ্র-রশ্মি প্রবেশ করে' বালিকার মুখে পড়েচে—কে যেন একরাশি হাসি বালিকার ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটিয়ে রেখেচে। রমাকে মনে করে' আমার চক্ষে জল এল। হায় রমা, তুমি যদি আজ বেঁচে থেকে তোমার ইন্দুর এ রূপরাশি দেখ্‌তে! আমি স্নেহের আবেগে বালিকার ঘুমন্ত মুখে চুম্বন কর্‌লুম।

সুহাসিনী হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে প্রবেশ কর্‌ল। তার অধরে সদাই হাসিটী লেগে থাকাতে তার নামের সার্থকতা করেছিল। সে বল্‌ল, 'ক গো মশায় কথাটা মনে আছে ত?' আমি বললুম, 'আজ অনেকটা রাত হয়েচে—যদি কিছু মনে না করত কাল'—

সুহা—তাত জানি। যাক্‌ ও কথা শুনে আমার কাজ নেই।

আমি তখন বললুম, 'রাগ করো না। তবে শোন।' সুহাসিনী উত্তর কর্‌ল,—"আমার গায়ে হাত দিয়ে বল মিথ্যে বল্‌বে না।"

আমি তখন একটু হেসে হাত জোড় করে' বল্‌লুম, 'হুজুরের কাছে কখনো মিথ্যে বল্‌ব না।'

সুহাসিনী তখন আমার গালে একটী মৃদু ঠোনা মেরে বল্‌ল—"ইস্—তাই ত!"

আমি আরম্ভ কর্‌লুম,—"রমার (ইন্দুর মা) বাবা রামধন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের সরেস্তাতেই কাজ্‌ কর্‌তেন। মহেন্দ্রপুরেই তাঁর পৈতৃক বাসভূমি। আমাদের বাড়ী থেকে তাঁর বাড়ী বড় বেশী দূরে ছিল না। চাকুরি-হিসাবে যদিও আমরা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুনিব-শ্রেণীভুক্ত ছিলুম, তথাপি গ্রাম-হিসাবে আমি তাঁকে জ্যেঠা মহাশয় বল্‌তুম এবং বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখ্‌তুম এমন কি বাবা মা পর্য্যন্ত তাঁকে যথেষ্ট সম্মান কর্‌তেন। সুতরাং এই দুই পরিবারের মধ্যে বিশেষ একটা আত্মীয়তা জন্মেছিল। রমা প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আস্‌ত এবং আমাকে 'দাদাবাবু' বলে ডাক্‌ত; কখন কখন আমার কাছে পড়া বলে' নিত। তার মা ছিল না, আমার মাকে মা বল' ডাক্‌ত। মাও রমাকে বড় স্নেহ কর্‌তেন। সুতরাং রমা যেন আমাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে' পড়েছিল। তার এক বিধবা মাসী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহকর্ত্রী

ছিলেন। কি জানি কেন তিনি রমাকে মোটে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। রমার একটী ছোট ভাই ছিল। ইহার বয়স যখন তিন মাস তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহিণী হঠাৎ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি বিশেষে মুস্কিলে পড়্‌লেন—মাতৃহীন শিশুর কি উপায় কর্‌বেন? অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে, অনেক অনুসন্ধানের পর রমার এই দূর সম্পর্কীয় বিধবা মাসীটীকে স্বগৃহে আনয়ন কর্‌লেন। জ্ঞানদাই রমার ভাইটীকে মানুষ করেন—বালক তাঁকেই মা বলে জান্‌ত। তিনি বালকটীকে বিশেষ স্নেহ-যত্ন কর্‌তেন, কিন্তু কি জানি কেন রমার প্রতি তাঁর একটী বিসদৃশ ভাব ছিল! একি কোন জন্মান্তরীণ রহস্য? চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে মাসে মাসে স্থানান্তরে গিয়ে দু' একমাস কাটাতে হত। তিনি যখন অনুপস্থিত থাক্‌তেন তখন রমার আর কষ্টের সীমা থাক্‌ত না। মাসীটী এই অবসরে রমার ওপর ঝাল ঝেড়ে নিতেন। মাসী যখন তাকে বক্‌তেন তখন সে কাঁদ কাঁদ মুখে আমাদের বাড়ী পালিয়ে আস্‌ত ও চুপ করে' একটী ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত। আমি স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌তুম, 'কি রমা অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?' সে কোন উত্তর কর্‌ত না। আমি তার হাত খানি ধরে' তাকে আমার পড়্‌বার ঘরে নিয়ে যেতুম এবং আমার গ্লাস-কেস্ হ'তে ভাল ভাল বই বার করে' তাকে দিতুম্। সে বাড়ী যেতে চাইত না—শেষে তার ভাইটী তাকে ডাক্‌তে আস্‌ত। আমি নিজে গিয়ে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতুম আর তার মাসীকে বলে আস্‌তুম্ 'আপনি রমাকে আর কিছু বল্‌বেন না। মা বলে' দিয়েচেন।'

জ্ঞানদা অমনি নাকি সুরে বল্‌ত, "আমি কি বাবা ওকে সাধ করে বকি? —আমার কি আর ওর ওপর মায়া নেই! ও স্বয়োর পেটের মেয়ে—ওকি আমার পর? আমার হাবুল (রমার ছোট ভাই) যেমন, রমাও তেমন!" এই বলেই জ্ঞানদা একটুকু মায়া কান্না কেঁদে নিত।

স্ত্রীলোকদের ওটা কেমন স্বভাবসিদ্ধ।

সুহাসিনী বল্‌ল "হুঁ, তারপর!"

"তারপর রমা প্রায় সমস্ত দিনই আমাদের বাড়ীতে থাক্‌ত। আমার গ্লাসকেস্ থেকে এ বইখানা, ও বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ত। আমার খাতায় তার নিজের নাম লিখ্‌ত—আমার নাম লিখ্‌ত—ছাই-ভস্ম আরো কত কি লিখ্‌ত—আমি তাকে কখনো কিছু বল্‌তুম না। সে যেন আমার কাছে থাক্‌তে বড় ভালবাস্‌ত—আমি তাকে নানারূপ সান্ত্বনা দিতুম।"

সুহাসিনী (একটুকু হেসে) বল্‌লে, "বল তাকে ভালবাস্‌তে আরম্ভ করলে।"

আমি তার রক্তিম চিবুক দুটী ঈষৎ নেড়ে দিয়ে বললুম—"না গো না, ঠিক্ তা নয়। তবে জানি নে রমা আমাকে ঠিক ভালবাস্‌ত কি না কিন্তু বালিকা-হৃদয় বোধ হয় আমার দিকে একটুকু ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু আমি তাকে বোনের মত দেখ্‌তুম। ভাই যখন বোনটীকে ভালবাসে আমিও তাকে তেম্‌নি ভালবাস্‌তুম্। এ ভালবাসার মধ্যে Romantic loveএর গন্ধ ছিল না। Romantic love কাকে বলে তা ত তুমি জান। একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েচি।"

এদিকে রমা ক্রমশঃই বড় হতে লাগ্‌ল। তার সমস্ত দেহে লাবণ্য যেন উপ্‌চে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে নিখুঁত সুন্দরী না হলেও তার অঙ্গসৌষ্ঠব, তার চলা-ফেরা, তার কথাবার্ত্তার মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যে, যাতে করে' লোকের হৃদয় সহজেই আকৃষ্ট হ'য়ে পড়্‌ত। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তার বিবাহের চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু সে সময় পণপ্রথা এম্‌নি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল যে, সহজে তার মাথা হেঁট করে এমন সুন্দরী খুঁজে পাওয়া যেত না। সে সময় বরের বাপ আর কিছুই চাইত না, চাইত কেবল টাকা। সুতরাং রমার সৌন্দর্য্য কোন বরের পিতার মনকে আদৌ গলাতে পার্‌ল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বড়ই মুস্কিলে পড়্‌লেন। তাঁর এমন সামর্থ্য ছিল না যাতে করে' তিনি মাতৃহীনা রমাকে একজন উপযুক্ত পাত্রের হাতে দিতে পারেন। এদিকে রমা প্রায় পনর বৎসরে পড়ো পড়ো হলো। বাবা একদিন রমার বাবাকে ডেকে বল্লেন, "দেখুন চক্রবর্ত্তী মশায় আপনি রমার জন্য ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করুন —আমি আপনাকে অর্থসাহায্য কর্‌ব।" তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন এবং গদগদ ভাবে পিতাকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানালেন। সুহাসিনী তোমাকে মিথ্যা বল্‌ব না, এমন সময় এমন একটা ঘটনা ঘট্‌ল যাতে করে' রমা আমার কাছে আস্‌তে লজ্জা বোধ কর্‌ত আর আমিও তার সঙ্গে তেমন স্বাধীনভাবে মিশ্‌তে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হতেম্। একদিন মা বাবাকে বল্‌ছিলেন, (আমরা উভয়েই তা' শুনেছিলুম) "তুমি রমার বিয়ের জন্যে টাকা দেবে কেন? তার চেয়ে রমাকে বউ করে' ঘরে নিয়ে এস না! আমার সুশীল ও রমা যেন একবৃন্তে দুটী ফুল। আর রমাও ছোট ঘরের মেয়ে নয়। তার বাবা গরীব, আর তোমারই একজন কর্ম্মচারী—এই বৈ ত নয়। তাতে যায় আসে কি? রমার মত বউ পাওয়া ভাগ্যের কথা। বাবা কথাটাকে তাচ্ছিল্য করে হেসে উড়িয়ে

দিলেন এবং প্রত্যুত্তরে এমন দু' একটা কথা বল্লেন যাতে করে' মা আর ও প্রসঙ্গে উত্থাপন কর্‌তে সাহস্ কর্‌লেন না।

আর একদিনের কথা বল্‌চি। সেদিন ৺বিজয়া দশমী। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভারি রকমের অসুখ হয়েছিল—তবে প্রায় সেরে উঠেছিলেন। আর ক'দিন থেকে বাপের অসুখের জন্য রমাও আমাদের বাড়ী আসেনি। তবে বাবা প্রতিদিনই লোক দিয়ে হ'ক আর নিজে গিয়ে হ'ক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের খবর নিতেন এবং ওষুধপত্রের ব্যবস্থা কর্‌তেন্। তাঁর বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষ ছিল না। বলতে ভুলে গেছি ইতিপূর্ব্বেই হাবুলের মৃত্যু হয়েছিল, আর সেই থেকেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শরীর খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল। সুতরাং তাঁর ভারি অসুখের সময় বাবারই একজন কর্ম্মচারী সর্ব্বদা তাঁর বাড়ীতে থেকে তাঁর তত্ত্বাবধান কর্‌ত। আমিও একদিন তাঁকে দেখ্‌তে যাব ভেবেছিলুম, কিন্তু রমার বিবাহের প্রসঙ্গের পর থেকে আমি আর তাদের বাড়ী যাইনি—একটা লজ্জাও বটে, আর পাছে বাবা জান্‌তে পেরে মনে কিছু করেন।

যাই হউক সেদিন বিজয়া। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাবাকে প্রণাম ক'রে এসে মাকে প্রণাম ক'রে যেমন উঠ্‌লুম অম্‌নি দেখি রমা আমার পশ্চাতে চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রমা মাকে প্রণাম ক'রে যেন কিছু লজ্জিত ভাবে আমাকে প্রণাম কর্‌ল। মা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি মা, কর্ত্তাকে প্রণাম ক'রে এসেছ?" রমা ধীরে ধীরে উত্তর কর্‌ল, "হাঁ, মা! তিনি বৈঠকখানা ঘরে বসে আছেন? আমি এসেই আগে তাঁকে প্রণাম করেচি।" মা রমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তার মুখে চুমু খেয়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। তারপর রমাকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে কাছে বসিয়ে নানা জিনিষ খাইয়ে বল্‌লেন, "আচ্ছা মা, তবে এস, রাত হয়ে যাচ্চে, আবার তোমার বাবা ভাব্‌বেন।" আর সেই সঙ্গে আমাকে ডেকে বল্লেন, "বাবা সুশীল তুই একবার রমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়, আর তার বাবা ও মাসীকে প্রণাম ক'রে আয়।" আমি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে রমাকে সঙ্গে নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বার হলুম। আমরা নীরবে যেতে লাগ্‌লুম। তাদের বাড়ীর কাছাকাছি একটা ঝোপের মত ছিল—তার ভেতর দিয়ে আমাদের পথ। সে স্থানটায় যেন কিছু অন্ধকার জমাট বেঁধে ছিল, আর সেখানকার রাস্তাটাও বড় ভাল ছিল না। সুতরাং সেখানে এসে আমি রমাকে বললুম, "রমা তুমি আমার হাত ধরো—এ জায়গাটা বড় উঁচু নিচু—প'ড়ে যেতে পার।" সে

কোন কথা না বলে আমার হাত ধর্‌ল। সত্যই বল্‌চি সুহাসিনী—সেদিনকার সে স্পর্শ—রমার হাত আরো অনেকব র ধরেচি—কিন্তু সেদিন সে হাত-ধরা আমাকে যেন একটা নূতন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌ল—একটা নূতন তাড়িত-শক্তি যেন আমার সমস্ত মনকে দোলা দিয়ে গেল। তখন আকাশে চাঁদ হাস-ছিল—কোথা থেকে পাখী ডেকে ডেকে উঠছিল। সত্যই বল্‌চি সুহাসিনী একটা স্বপ্নরাজ্য তখনি আমার চখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল, আর সে রাজ্যের রাণী যেন রমা। আমার অস্তিত্ব যেন কোথা উড়ে গেচে—আমি কোথা আছি তার যেন ঠিকানা নাই! আমার মুখে কোন কথা নাই, রমার মুখেও নাই। আমি যাচ্চি না স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি—তা' যেন বুঝে উঠ্‌তে পার্‌চি না। হঠাৎ রমার মাসীর কথায় আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। জ্ঞানদা বলে উঠ্‌লেন, "এস বাবা সুশীল এস।" এই বলেই তিনি চক্রবর্ত্তী মহা-শয়কে খবর দিতে গেলেন। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে রমার প্রতীক্ষা কর্‌ছিলেন। আমি তখনই বেশ বুঝ্‌তে পারলুম, রমাদের বাড়ীতে এসে পৌঁছেচি! আমি যে কখন রমার হাত ছেড়ে দিয়েচি তা' মনে নাই। যাই হোক, আমি ভেতরে গিয়ে তার বাবা ও মাসীকে প্রণাম কর্‌লুম। তাঁরা যথারীতি আমার মঙ্গল কামনা কর্‌লেন। তার পর আমি বাড়ী ফির্‌লুম। পথে যতক্ষণ এসেচি ততক্ষণ কেবল রমার কথাই ভেবেচি। সে রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি—কেবল রমাকেই স্বপ্ন দেখেচি।

তার পর হঠাৎ একদিন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাবাকে খবর দিলেন, রমার বিবাহ। বর নবকান্ত মুখোপাধ্যায়—মস্ত কুলীন। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশী হবে—তবে শরীরে বেশ সামর্থ্য আছে। আর তার আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। তৃতীয় পক্ষের এক কন্যা ছিল, তা' অল্পদিন হ'লো মারা পড়েচে। অধিকন্তু বরের অনেকগুলো টাকাও আছে।

বাবা শুনে যেন বড় দমে পড়্‌লেন। তিনি অনেকক্ষণ কি ভেবে বল্‌লেন "তাই ত চক্রবর্ত্তী মশায় এর চেয়ে ভাল পাত্র আর পেলেন না। আমি ত তার জন্যে আপনাকে সাহায্য কর্‌ব বলেছিলুম।" তার পর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন, "যাক্ যখন ঠিকঠাক্ ক'রে ফেলেচেন শুন্‌চি—আর আমাকেও ত তার পূর্ব্বে একবার জানাতে হয়"—তিনি আর কিছু না বলে চিন্তিত অন্তরে সে স্থান ত্যাগ কর্‌লেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিলক্ষণ লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌লেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়ে উঠ্‌ল।

মা শুনে খুব দুঃখ কর্‌তে লাগ্‌লেন। বাবা ও মায়ের মধ্যে একটা ছোট খাট বচসা পর্য্যন্ত হয়ে গেল। মা বল্‌লেন, "এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে বল।" বাবা বল্‌লেন, "তা আমি পার্‌ব না।"

রমা সে বিবাহে সুখী হয়েছিল কি না জানি না। তবে সেই বিবাহের রাত্রে সম্প্রদানস্থলে আমি তাকে একবার মাত্র দেখেছিলুম—সেও আমার পানে একবার চেয়েছিল মাত্র। কিন্তু সে চাহনিতে যে কত ব্যথা, কত কাতরতা, কত তিরস্কার লুকান ছিল, তা' আর বলা যায় না। তার চাহনি যেন বল্‌ছিল—"শেষে তোমরা আমায় জলে ফেলে দিলে।"

রমার বিবাহের পরই আমি কলিকাতায় চ'লে আসি? আর অনেকদিন দেশে যাইনি, কারণ তখন আমি বি-এল'র জন্য প্রস্তুত হতেছিলুম, আর বাবা ও মা বেশীর ভাগই আমাদের এই কলিকাতার বাড়ীতে এসে থাক্‌তেন।

বি-এল পরীক্ষা দিয়েই দেশে ফিরি। গিয়ে শুন্‌লুম অতি অল্পদিন হল রমা বিধবা হয়েচে, আর তার মাসীটীও মারা গেচে। চক্রবর্ত্তী এখন এক প্রকার উন্মাদরোগগ্রস্ত। তার বিপদের কথা শুনে আমি বিশেষ মর্ম্মাহত হলুম।

আমি একদিন তাঁর বাড়ীতে না গিয়ে থাক্‌তে পারলুম না। রমার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্‌লেন, "এই দেখ বাবা, এ আর এক জ্বালা—রমা আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সে বড়ই কাহিল। পরে রমাকে ডেকে বল্লেন, "ওমা রমু, তোর দাদা বাবু এসেচেন, তাঁকে প্রণাম কর্‌বি আয়!" রমা আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আমার কাছে এল এবং অতি সঙ্কুচিত ভাবে আমাকে প্রণাম কর্‌ল এবং আমার পদধূলি নিল এবং আবার আস্তে আস্তে সে স্থান পরিত্যাগ কর্‌ল। তার মাথায় কাপড় ছিল, সুতরাং তার মুখখানি ভাল ক'রে দেখ্‌তে পেলুম না। কিন্তু তার বাহ্য আকৃতি দেখে স্পষ্টই বুঝলুম সে রমা আর নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও অবস্থা অতীব শোচনীয়—আমি তাঁকে অনেক রকমে প্রবোধ দিলুম। তিনি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লেন, "রমার যে কপাল পুড়্‌ল, আমিই তার একমাত্র কারণ।" আমি বললুম, "ওসব কিছু নয়—অদৃষ্টে যেটুকু আছে হবেই।"

বাড়ী ফিরে এসেই শুন্‌লুম আমি বি-এল পাশ করেচি। বাবার একজন বিশিষ্ট বন্ধু এই সুখবরটী তাঁকে তার ক'রে জানিয়েচেন। আমার মনে বড়ই আনন্দ হল। কিন্তু এই আনন্দের অন্তরালে যে ভয়ঙ্কর একটা বিষাদ লুক্কা-য়িত ছিল তা' আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ইহার এক সপ্তাহের পরই পিতৃদেব

স্বর্গারোহণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর মাস খানেকের মধ্যেই সতী সাধ্বী মা আমার স্বামীর অনুসরণ করলেন। আমি প্রথমটা খুবই দমে পড়েছিলুম, কিন্তু কালে সবই সহ্য হয়ে যায়। আবার অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই আমিই আমার বিষয়-সম্পত্তি নিজেই তত্ত্বাবধান করতে মন দিলুম। * * *

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি রমাদের বাড়ী গেলুম। দেখি রমা ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর পেতে শুয়ে আছে। সে আমাকে দেখ্‌বামাত্র শশব্যস্তে উঠে পড়্‌ল এবং আপনাকে খুব সংযত ক'রে ও মাথার কাপড় বেশ ক'রে টেনে দিয়ে বল্‌ল,—"বাবা বাড়ী নাই।" আরও বল্‌ল, "বাবার ফির্‌তে দেরী হবে আর ঝি পুকুর-ঘাটে বাসন মাজ্‌তে গেছে, সুতরাং আমার আর সেখানে অপেক্ষা করা উচিত নয়—লোকে কলঙ্ক দিতে পারে।" কথাগুলো শেষ করেই সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আমি হতভম্বের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইনু। যখন আমার আত্মবিস্মৃতির ভাবটা কেটে গেল, তখন আর ক্ষণবিলম্ব না ক'রে একেবারে রাস্তায় এসে পড়্‌নু। একবার ভাব্‌নু রমা বড়ই নির্ম্মম, আবার ভাব্‌নু রমা কত উচ্চ, আর মনে মনে তার প্রশংসাও করলুম। তবে সত্যই বল্‌চি বারকয়েকের জন্য রমার ওপর খুব রাগও হয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৈঠকখানা ঘরে ব'সে আমার গোমস্তার সঙ্গে বিষয়-সংক্রান্ত কথা বল্‌চি এমন সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি বিষণ্ণমুখে সেই ঘরে প্রবেশ করেই বল্লেন, "বাবা সুশীল, রমার বড় অসুখ।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন হয়েচে কি?"

তিনি উত্তরে বল্লেন, "আজ প্রায় আট দিন হলো রমার একটী কন্যা জন্মেচে। সে ভূমিষ্ঠ হবার পরই রমার একটুকু জ্বর হয়—ক্রমশঃ সেই জ্বর বৃদ্ধি পেয়ে কাল থেকে কিছু সাংঘাতিক রকমের দাঁড়িয়েচে। সে অনেক ক'রে তোমাকে একবার যেতে বলেচে—সে তোমাকে একবার দেখ্‌তে চায়।"

আমি আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারলুম না—চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়্‌লুম। গিয়ে দেখলুম রমা বিছানায় প'ড়ে ছটফট কর্‌চে, আর ঝি কাছে বসে খুব জোরে পাখার বাতাস করচে। শুন্‌লুম রমার ভয়ঙ্কর গাত্র-দাহ হচ্চে আর পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্চে। অথচ ডাক্তার বেশী জল দিতে বারণ করেচেন। কন্যার অবস্থা দেখেই বৃদ্ধ কেঁদে ফেল্‌লেন এবং ক্ষণবিলম্ব না ক'রে ডাক্তারকে খবর দিতে ছুট্‌লেন। আমি ঝিকে একটুকু দুধ গরম ক'রে আন্‌তে বল্লুম এবং রমার কাছে ব'সে ধীরে ধীরে বাতাস করতে

লাগ্‌লুম। দেখলুম পার্শ্বে তার নব-প্রসূতা কন্যাটী—আমাদের ইন্দু—যেন একটী টুক্‌টুকে পুতুল—কান্না নাই, নড়ন-চড়ন নাই—যেন চাঞ্চল্যের লক্ষণমাত্র নাই, যেন সে তার মায়ের অসুখ মনের মধ্যে সম্যক অনুভব ক'রে চুপটী ক'রে পড়ে আছে। রমা একটুকু ক্ষীণ হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে রইল; তার চোখে দু' ফোঁটা জল! তারপর সে আমাকে পাখার বাতাস করতে নিষেধ কর্‌ল এবং তার ডান হাতখানি আমার কোলের কাছে এগিয়ে দিল। আমি একটুকু ইতস্ততঃ কর্‌চি দেখে, সে অতি ক্ষীণস্বরে বল্‌তে লাগল—"সুশীল ভাইটী আমার সেই বিজয়ার রাত্রে যেমন ক'রে আমার হাতটী ধরেছিলে, ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে আর একবার ধর। আমার সময় হ'য়ে এসেচে—আর বেশী দেরী নেই। তুমি যে আমার ওপর অভিমান ক'রে এতদিন আসনি তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিনু। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইচি। বল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর্‌লে। হায় বড় দুঃখেই জীবনটা কেটে গেল। শৈশবে মায়ের স্নেহ পাইনি, যৌবনে স্বামি-স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হলেম—নারীর যা' সৌভাগ্য তা' আমার অদৃষ্টে জুট্‌ল না। এখন আশীর্ব্বাদ করো যেন স্বামীর পদতলে গিয়ে আশ্রয় পাই—হিন্দু রমণী আর কিছু চায় না। আর এক কথা আমি চলে গেলে বাবাও আর বাঁচ্‌বেন না। আমার মেয়েটা রইল তুমি তার ভার নিও; এই আমার শেষ অনুরোধ।"

রমা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ক্ষীণস্বরে আবার বল্‌ল, "বল, নিলে"—তাহলে আমি নিশ্চিন্তে মর্‌তে পার্‌ব।"

আমি তার হাতখানি ধরে' অঙ্গীকার করলুম। সে নীরবে আমার পদধূলি নিল।

সেদিন পূর্ণিমা রজনী। আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা দিয়েচে। জ্যোৎস্নায় চারদিক্ ভ'রে উঠেচে। কোথা থেকে একটা শ্যামা অবিরত শিস্ দিচ্চিল। সহসা রমা আমাকে বলে উঠ্‌ল, "বাইরে কেমন জ্যোৎস্না, আমাকে দাওয়ায় শুইয়ে দিবে চলো। সেই সেদিন যেখানে শুয়েছিনু"—

হঠাৎ সে যেন কেমন ধারা হয়ে গেল! তার স্বর কেমন জড়িয়ে এল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগ্‌ল। এদিকে কক্ষের প্রদীপটাও নিবু নিবু হয়ে এলো। এমন সময় ঝি গরম দুধ নিয়ে উপস্থিত হলো। আমি রমার মুখে একটুকু দুধ দিলুম, কিন্তু গলাধঃকরণ হলো না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার শেষ নিঃশ্বাস অনন্তে মিলিয়ে গেল। আমি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লুম।

যে মুহূর্ত্তে সব ফুরিয়া গেচে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডাক্তার নিয়ে উপস্থিত হলেন।

বৃদ্ধ মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন। আর তাঁর মূর্চ্ছা ভাঙ্গল না। সেই রাত্রেই পিতা-পুত্রী পাশাপাশি চিতায় শয়ন কর্‌লেন।

আমাকেই তাঁদের শেষ কাজ কর্‌তে হলো। আর সেই অবধি ইন্দু আমার পালিতা কন্যা।

অনেকদিন ধরে মনটা বড়ই খারাপ হয়েছিল। তার পর তুমি আমার সুহাসিনী এসে আমার চিত্তসাগরে নবীন হর্ষের হিল্লোল তুলে দিয়েছ।

* * * * *

এখন যে রাত জেগে গল্প শোনানু তার পুরস্কার ?

সুহাসিনী তার রাঙ্গা ঠোঁট দুটী আমার মুখের কাছে এগিয়ে দিল। আমি পুরস্কার আদায় করে নিলুম—আর বল্‌লুম অনেক রাত হয়েচে, এখন ঘুমিয়ে পড়।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ।

নববর্ষে।

মা!

আজি তোমারি পূজার নব আয়োজন,
বিশ্ব এসেছে সাজি' ;
পরি রম্য হরিত পট্ট-বসন,
করে কুসুমের সাজি।
তা'র ভক্তি-পূর্ণ আনত নেত্র,
মৃদু মন্থর গতি ;
চির পুণ্যের জ্যোতি পূর্ণ আনন,
জেগেছে প্রকৃতি সতী।
সে যে এনেছে বহিয়া মলয় পবন,
চারুচন্দন-বাস ;

তা'র কৌমুদী-ধারা- ধৌত শুভ্র
আকাশে স্নিগ্ধ হাস!
তব বন্দনা-গীতি গাহে পাখী সব,
কণ্ঠে নূতন ভাষ ;
আজি নব সাধনায় সন্ধি-পূজায়
পূরাও দীনের আশ।
তুমি ছিন্ন কর এ বন্ধন দৃঢ়,
উঠাও হস্ত ধরি ;
কর রুদ্ধ নয়ন মুক্ত, দেখি মা,
নবালোক আঁখি ভরি'।
তুমি জাগাইয়া তোল সুপ্ত পরাণ,
গুপ্ত থেকো না আর ;
আজি প্রকাশি মহিমা সম্মুখে আসি',
দাঁড়াও মা একবার।
আমি অঞ্জলি ভরি' অর্পণ করি,
আমার যা' কিছু সব ;
এই হৃদয়ের মাঝে জ্বলিয়া উঠুক,
তোমার শঙ্খ-রব।
মা গো তোমারি পূজার নব আয়োজনে,
বিশ্ব এসেছে সাজি',
স্নেহে লও মা তোমার মন্দির-দ্বারে,
সন্তানে টানি' আজি!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতীয় অভ্যুত্থান।

ফ্রান্সে থাকিতে থাকিতে এক সময় কোন উচ্চবংশীয়া কুমারীর বাটীতে একটা 'Spiritual circle' হয়। আমিও তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম। তথায় মহাত্মা ভল্‌ত্যার 'মিডিয়মে'র মুখে যে অমূল্য উপদেশগুলি সস্নেহে আমায় দান করেন তাহা স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া 'সাহিত্যের' পাঠক-পাঠিকাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক উপহার দিলাম।

ভল্‌ত্যার।—প্রণাম বন্ধুবর্গ! আপনারা আমায় আহ্বান করেছেন?

আমি।—শুভাগতম্! হে মহাত্মন্ আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। জানি না আপনার সহিত কোনও দিন আমার পরিচয় ছিল কিনা, কিন্তু তাহা না হইলেও আপনি মুক্তিবাণী প্রচার করিয়া আজ জগতের বন্ধু। ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে আমার জন্মস্থান। আমি আজ আপনার নিকট কিছু উপদেশাকাঙ্ক্ষায় আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। তিনটী প্রশ্ন যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তর দেন ত আমি কৃতার্থ হই।

আপনি যে দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, যাকে আমরা পরপার নামে অভিহিত করি—সে দেশের কোন ধারণাই কি মরজগতের লোকে সম্ভব নয়? আর সে অজানা লোকে আপনাদের অস্তিত্বই বা কিরূপ—এ প্রশ্ন চির-দিনই মনুষ্য-সমাজকে আলোড়িত করিয়াছে—ইহাই আমার প্রথম প্রশ্ন।

ভল্‌ত্যার।—এই বিপুল বিশ্বের অন্তর্বাহিরে যে সত্তা ক্রীড়ারত, তাহাতেই সমুদ্র-বুদ্‌বুদ্‌বৎ মনুষ্যজন্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশাল 'ইথর'-সমুদ্রের মাঝে একটা বিদ্যুৎবিকাশ, আবার সেই অনন্ত সত্তায় নিমজ্জিত হয়। যখন জীবন ফুটিয়া উঠে তখন সে স্বতন্ত্র। তারপর যখন অনন্ত সাগরে মিলিত হয় তখন তাহাকে আর বিভিন্ন করা সহজ হয় না। তবুও উপযুক্ত যন্ত্রসাহায্যে সেই ব্যক্তিত্বকে আবার অতলের তল হইতে তুলিয়া জ্ঞানগোচর করা যায়। 'সেন' নদী জলে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বিদ্যুৎবার্ত্তাবহ যন্ত্র হইতে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা আবার 'সুয়েজ প্রণালি'-পথে সমাচার দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। মৃত্তিকা স্পর্শমাত্র বিশিষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ, অনন্ত প্রবাহের মধ্যে, তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে; কিন্তু আবার উপযুক্ত যন্ত্রসাহায্যে সেই নির্ব্বিশেষের মধ্য হইতে বিশিষ্ট

প্রবাহটি বাহিয়া লওয়া যায়। মনুষ্য জীবনও এইরূপ। মহা একীভূতের মধ্যেও বিশিষ্টতা থাকে, নির্ব্বিশেষের মত হইয়া। কেন না বিশ্বসত্তা অব্যক্তি-গত সত্তা উভয়ই সত্য। দেখ আমরা কি জগৎ হইতে একেবারে গিয়াছি—শুধু যে আমার চিন্তাপ্রবাহ চিরতরে রহিয়া গিয়াছে তাহা নহে আমার জীবনের ক্ষুদ্রতম বৈশিষ্ট,—অভ্যাসাদি, আজও তোমাদের সম্মুখে আসিয়া প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে; আবার তোমরা আমায় ত্যাগ করিলে সব বিলীন হইয়া যাইবে। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন?

আমি।—ফরাসী বিপ্লবের দিব্য পুরোহিত আপনি, ফরাসী বিপ্লবের অত্যা-শ্চর্য্য ঘটনার কথা আপনার নিকটে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

ভল্‌ত্যার।—ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিনের ঘটনাটিই অত্যাশ্চর্য্য। আমরা ঐ দিন জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করি নাই। কিছুই জানা ছিল না। হঠাৎ একদিন পুণ্যপ্রভাতে সারা প্রপীড়িত রাজ্যটিতে একটা জাগরণের সাড়া পড়িল। সকলে নূতন একটা কিছু অনুভব করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অনুভব ঘনীভূত হইয়া হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করিল; তারপর চিত্ত প্লাবিত করিয়া সে প্রেরণাপ্রবাহ প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল—সকলে বুঝিল, আজ দিন আসিয়াছে—যাহার অপেক্ষায় এই যুগব্যাপী কাল সহস্র অত্যাচারও উপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু কি করিতে হইবে, কে তাহার উত্তর দিবে? সেদিন আর কাহারও গৃহ-কর্ম্মে মন লাগিল না। ছেলেরা বিদ্যালয়ের রাস্তায় বসিয়া উদাসভাবে চিন্তারত; গৃহিণী সম্মার্জ্জনী হস্তে রেলিং ধরিয়া স্ফীত বক্ষে যেন আকাশমণ্ডলে কোন ভবিষ্যদুক্ত ঝটিকার আগমন নির্দ্দেশ অবলোকন-পরায়ণা; কৃষকগণ হল হস্তে, রক্ত মুখে যেন কোন অজানা শত্রুর আগমন-প্রতীক্ষায় কম্পিত দেহ, কারিগর যন্ত্র হস্তে বিস্ফারিত-কর্ণ—যেন কোন সঙ্কেতের প্রতী-ক্ষায় বসিয়া আছে, পথনির্ম্মাতা কোদালী ও কুঠার হস্তে উদ্‌গ্রীব ভাবে যেন কাহার আগমন-প্রতীক্ষায় বিস্ফারিত নেত্র। সেদিন মা ছেলেকে আর তেমন করিয়া স্তন্যদান করিল না—বালক প্রাতে খাবারের জন্য আব্দার করিতে ভুলিয়া গেল, স্ত্রী প্রতিচুম্বনের জন্য আর স্বামীকে নিদ্রা-বিমুখ করিল না, ভৃত্য প্রভুকে প্রাতঃপ্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল, মুক্ত গাভীদল ও ঘোটকবৃন্দ অলক্ষিতে অবাধে নব শস্য চর্ব্বণ করিতে লাগিল। ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিল; দোকান খুলিল না; ভক্ত পূজা পরিত্যাগ করিল; মন্দিরে যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়া-ইল; শ্রমজিবী কর্ম্মশালায় গমন করিল না। একেবারে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যবসায় শিল্প

বাণিজ্য সব স্তব্ধ, বন্ধ—বোধ হয় তস্করেরাও তাহাদের চৌর্য্য-চিন্তা পরিত্যাগ করিল।

হঠাৎ দেখা গেল একদল লোক "প্যারী"র রাজপথ দিয়া ছুটিয়াছে। পথের দুপাশে যাহারা ছিল ছুটিয়া বাহির হইল, ভাবিল বুঝি ইহারা এই অন্তরা হ্বানের কিছু সংবাদ রাখে। মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে জনতা আসিয়া এক বিরাট সঙ্ঘের সৃষ্টি করিল। তারপর কোথা হইতে আর একদল আসিয়া প্রথম দলে যোগ দিল, তারপর আর একদল, তারপর আরও একদল। শেষে কে আর তাহার সংখ্যা করিবে! সে বিপুল বাহিনী ধীর ও দৃঢ় পদবিক্ষেপে নগরীর সর্ব্ববৃহৎ রাজপথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একের পর এক সুদৃশ্য 'বুলেভার' গুলি অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাহারা নগরীর মধ্যস্থলে উপনীত। কেহ জানে না কোথায় তাহাদের গন্তব্য—কি তাহাদের লক্ষ্য। কিন্তু কেহ ইতস্ততঃ করিল না—কেহ পিছাইল না, কেহ নিজ পরিজনের দিকে লক্ষ্য করিল না। সে ভাব-বন্যা সারা প্যারী প্লাবিত করিয়া ছুটিল। হঠাৎ এক গগনভেদী নিনাদ দশদিক ধ্বনিত করিয়া তুলিল—'বাস্‌তিল্'! সে ধ্বনি অন্তরীক্ষে, ভূধরশিখরে, অট্টালিকায়, কুটীরে, পাতালে, জলে মথিয়া প্রকম্পিত করিয়া, প্রতিধ্বনিত হইয়া সেই বিশাল জনসঙ্ঘকে পাগল করিয়া তুলিল।—লোক চারিদিকে ঐ নাম প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিল। স্ত্রীর আহ্বানে শুনিল—বাস্তিল! শিশুগণের ক্রন্দনে শুনিল—বাস্তিল্! বৃদ্ধের আর্ত্তনাদে শুনিল—বাস্তিল্! যুবকের উল্লাসে শুনিল—বাস্তিল্! প্রাসাদ-সমূহের প্রতি গবাক্ষ দিয়া ঐ শব্দ যেন ছুটিয়া আসিতে লাগিল। লণ্ঠনের থামে ঠেকিয়া ঐ ধ্বনি ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল—সকলে মাটীর দিকে চাহিল শুনিল—বাস্তিল্! উপরে শ্বাসগ্রহণের প্রয়াসে শুনিল—বাস্তিল্! চক্ষু বুজিয়া দেখিল—বাস্তিলের গর্ব্বিত চূড়া। চক্ষু মেলিয়া দেখিল—বাস্তিলের উচ্চ চূড়া। মনের ভিতর দেখিল—বাস্তিলের ঘৃণিত কারাগার। প্রাণের ভিতর দেখিল—বাস্তিলের ভয়াবহ অন্ধকূপ। আত্মায় আত্মায় অনুভব করিল—বাস্তিলের উপর তাহারা ছুটিয়াছে। দিব্য চক্ষে দেখিল—বাস্তিল ধূলা-বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। সকলে ভাবিল—মাতৃভূমি আজ দৈববাণী করিয়াছেন। কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। কেহ কেন জিজ্ঞাসা করিল না। কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিল না। সকলে সেই দুর্জ্জয় পাষাণ-নির্ম্মিত কারাগারের কূপ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল, মহাহুঙ্কারে—বিকট-নিনাদে, আল্পসের বন্যার মত, পর্ব্বত-বিচ্যুত তুষার শিখরের মত। সত্যই

জাতির অন্তরাত্মা এই সঙ্কটকালে তাহাদের চির লক্ষ্য, চির ঘৃণিত, চির ভয়প্রদ বাস্তিলকেই সেই প্রথম বিপ্লব-বাহিনীর প্রধান অন্তরায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিল।

বাস্তিলের সিংহ-দ্বারে জনতা আসিয়া থামিল। তাহাদের কাহারও বিশেষ কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। কর্ম্মকার ভুলিয়া তাহার হাতুড়ী আনিয়াছিল, সূত্রধর তাহার মুদ্গর আনিয়াছিল, পথনির্ম্মাতা তাহার কোদালী আনিয়াছিল, পরিচারিকা তাহার সম্মার্জ্জনী লইয়া আসিয়াছিল। শকট-চালক আসিয়াছিল তাহার বেত্র হস্তে, ঔত্থানিক তাহার খনিকাহস্তে, কাঠুরিয়া তাহার কুঠার হস্তে। মাঝে মাঝে কেবল দুই একটী বন্দুকের নল সূর্য্যালোকে ঝকমক করিতেছিল, দুই একখানি তরবারি চকমক করিতেছিল, দুই একখানি সঙ্গীন মৃত্যুদূতের জিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করিতেছিল। কিন্তু সেই পার্ব্বত্য লৌহদুর্গের বিরুদ্ধে দুই একখানি বন্দুক বা তরবারি কি করিবে?

উপরে সৈন্যগণ সে নিরস্ত্র-বাহিনীর ভাবগতিক দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। দু একটা ফাঁকা আওয়াজ হইল, দু'একটা সত্যিকার গুলিও ছুটিল, দু'একজন হতাহতও হইল—কিন্তু কেহ নড়িল না।

সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। সামনের লোক পিছনে ফিরিল, পিছনের লোক সম্মুখের দৃশ্য দেখিতে উদ্‌গ্রীব হইল। মধ্যস্থলে ভীষণ চাপ হইয়া পড়িল। এইরূপে কিছুক্ষণ সেই মুগ্ধ জনতা সম্মুখে ও পিছনে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। ক্রমে পিছন হইতে ধাক্কা অধিক আসিতে লাগিল, সম্মুখের লোক ক্রমেই নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। মধ্যস্থলে স্থান হওয়াতে আবার একটা ধাক্কা আসিল—সম্মুখের লোকেরা আর প্রত্যুত্তর করিল না। শেষে পিছন হইতে সম্মুখে এক ভাবে চাপ আসিতে লাগিল। দুর্গশৃঙ্গে যাহারা ছিল তা'রা দেখিল দুই মাইল দীর্ঘ সব পথটি জনতায় পরিপূর্ণ। একটি কুক্কুর-শাবকেরও আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। তাহারা ভাবিল এই বেশ সুযোগ হইয়াছে, এইবার কামান দাগা যাক। তাহারা সকলে কামানের মুখ ঘুরাইয়া রাজপথের দিকে ফিরাইয়া ধরিল।

এমন সময় কোথা হইতে এইরূপ আর এক বিপুল জনতা আসিয়া উন্মত্তবৎ সেই রাজপথে দ্রুত প্রবেশ করিল। তাহাদেরও কেহ নেতা ছিল না। কেহ তাহাদিগকে থামাইতেও পারিল না। সকলকে দলিয়া মথিয়া নিষ্পেষিত করিয়া সেই দুর্দ্দমনীয় জনস্রোত বাস্তিল অভিমুখে ছুটিল। মড় মড় শব্দে সহসা দুর্গের লৌহ সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল, হুড়মুড় করিয়া পর্ব্বতপ্রাচীর ভূপতিত হইল—

সহস্র সহস্র লোক নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। আরও সহস্র সহস্র পথে পদদলিত হইল—আরও সহস্র শ্বাসরোধ হইয়া মারা পড়িল। তারপর সেই মত্ত বাহিনী ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্গ মধ্যে সৈন্যদল মথিত করিয়া প্রবেশ করিল। রক্ষীদিগের আর কামান দাগা হইল না, সেনানিবাসের আর কাহারও রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইতে হইল না—সেনানীগণের আজ্ঞাও কেহ শুনিতে পাইল না। সকলে নিমিষ মধ্যে ভূতলশায়ী হইল। -কে কাহাকে মারিল—কিরূপে মারিল—কে জানে!

তারপর কারাগার-দ্বার চূর্ণ—ঝন্ ঝন্ করিয়া খসিয়া পড়িল। বিপ্লববাদীদের জয়-ধ্বনি আকাশ মুখরিত করিল—কঙ্কালসার আবদ্ধদিগকে নির্ব্বাণ-কূপ * (Oubliette) হইতে তুলিয়া আনা হইল। কেহ কেহ তাহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল—যেন প্রেত-সঙ্ঘ মৃতদেহ স্কন্ধে আনন্দে তাণ্ডবাভিনয় করিতেছে। লোকে এই অত্যাচার-নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়া হৃদয়ে দ্বিগুণ বল পাইল। প্রথম বিপ্লব-দিবসের সন্ধ্যা আগমন করিল। সাধারণ মানব-জীবনে, সে ব্যষ্টিই হ'ক আর সমষ্টিই হ'ক, উত্থান-পতনের একটা ক্রম, কার্য্য-কারণের একটা হারাহারি সম্বন্ধ আছে। যেমন জল, এতটা উত্তাপ কম করিলে এতটা শীতল হয়; তাহার দ্বিগুণ করিলে দ্বিগুণ শীতল ও গাঢ় হয়; তাহার দশগুণ করিলে দশগুণ শীতল ও গাঢ় হয়। কিন্তু জমিয়া যাইবার প্রক্কালে (Critical temperature) আর এই ক্রমিক নিয়ম খাটে না। দুই ডিগ্রী এমন কি এক ডিগ্রীতেও জল তরল থাকে, তারপর আর একটু ঠাণ্ডা করিলেই জল জমাট হয়। এই অবস্থায় জ্যামিতির প্রকরণানুসারে (Geometrical progression) কারণ-সংযোগে কার্য্য হইতে থাকে। সেইরূপ জাতীয় জীবনসঙ্কটকালে (national cricis) সামান্য একটি কারণ প্রজ্বলিত অগ্নিবর্ত্তিকাবৎ সমগ্র প্রপীড়িত (দাহ্য পদার্থপূর্ণ) সমাজকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। দেখ কত ক্ষুদ্র ঘটনা আজ এই বিরাট ইউরোপীয় মহাসমরের হেতু—কত সামান্য ঘটনা রুষবিপ্লবের অগ্নিশলাকা। শান্তিতে মানব-জীবন একটা সহজ প্রকরণে (Arithmetical progression) চলে—সঙ্কটকালে জাতীয়

* পূর্ব্বে ইউরোপে রাজদ্রোহী ও ভিন্নধর্ম্মীদিগকে কারাগারের ৩০।৪০ ফুট গভীর কূপে নিক্ষেপ করা হইত। কয়েক দিবস অন্তর একটু জল ও একটু রুটি তাহাতে দড়ি দিয়া নামাইয়া দেওয়া হইত। একবার প্রবেশ করিত, তাহাকে আর বহির্গত হইতে হইত না। হত্যা না করিয়া কেবলমাত্র কষ্ট সহ্য করিয়া বিধর্ম্মীর আত্মপ্রসাদ বর্জ্জন করিবার জন্যই তাহাদিগকে একটু বাঁচ ইয়া রাখা হইত। আমি স্বচক্ষে বহু পুরাতন ক্যাথলিক মন্দিরে এইরূপ গভীর নির্ব্বাণ-কূপ দর্শন করিয়াছি! সে দেশের লোকের ধর্ম্ম অপেক্ষা ঘৃণার বস্তু কি হইতে পারে?

জীবন অদ্ভুতভাবে (Geometrical progression) পরিবর্ত্তিত হয়। প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম সামঞ্জস্যের ইহা একটী অন্যতম উদাহরণ।

এইবার তোমার তৃতীয় প্রশ্ন?

আমি। অধুনা আমাদের দেশে জাতীয় অভ্যুত্থানের একটা রব উঠিয়াছে। সে মুক্তি-কোলাহলের মধ্যে যতই বাহাড়ম্বর থাক না কেন, তাহার মধ্যে একটা সত্য, মূর্ত্ত, জাগ্রৎ, একটা জাতিগত প্রেরণা আছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পথে আমার দেশবাসিগণ স্বতঃ নীত হইতেছেন তাহা ধ্বংসের প্রারম্ভ কিম্বা নবসভ্যতার পুণ্যপ্রভাত তা' জানি না। আমার ন্যায় অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবকের পক্ষে এ বিষয়ে কোন ধারণাই সম্ভবে না। জীবনের এই উনবিংশ বৎসরের মধ্যে, বহু আয়াস সত্ত্বেও, কি পার্থিব, কি অপার্থিব, কোন জ্ঞানই, অত্যল্পও অর্জ্জন করিতে পারি নাই। আপনার মুখে জাতীয় উত্থান-পতনের দুই একটি উপদেশ-প্রত্যাশায় এই তৃতীয় প্রশ্নটি আপনার নিকট উপস্থাপিত করিলাম।

ভল্‌ত্যার। জাতীয় জীবন, জাতীয় সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতি সকলই জাতীয় অন্তরেরই অভিব্যক্তি। জাতীয় প্রেরণা, জাতীয় সংস্কার, এই দুই উপাদানে জাতীয় অন্তরাত্মা। জাতীয় সংস্কার, জাতীয় যুগযুগান্তরের জীবন-প্রবাহের ইতিহাস, জাতীয় প্রবণতা এই দুয়ের সমষ্টি! ইহাকে সাধারণ ভাষায় জাতীয় চরিত্র বলা যায়। কি ব্যক্তি, কি সমষ্টি, কি জাতি সকলেই এই চরিত্র-বলে কার্য্য করে—এই সংস্কারই জীবন-প্রবাহের গভীরতম উৎস। বহু পণ্ডিত-গণের এই ভ্রমাত্মক ধারণা—প্রজ্ঞা, বিবেক বুদ্ধি—ব্যক্তিজীবনের এবং সমষ্টি ও জাতীয় জীবনের নিয়ন্তা। ইহার কারণ পণ্ডিতগণের ঐতিহাসিক ঘটনা-সমূহের এবং বর্ত্তমানের ঘটনাবলির, এমন কি নিজ জীবনের কর্ম্মনিচয়ের নিরপেক্ষ পরিদর্শন, তুলনা ও সহজ বিশ্লেষণের অভাব। ইহা অপেক্ষা গভীরতর অভাব তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব-বেদের। সকল ঈপ্সার পশ্চাতে যে অদৃশ্য চিত্ত, সকল প্রকম্পনের পিছনে যে অদৃশ্য মন, সকল আবেশপুঞ্জের পিছনে যে অদৃশ্য প্রাণ, সকল জড়তা ও তৎপরতার পিছনে যে জন্মজন্মান্তরের অভ্যাস সমগ্র জীবনটিকে ধরিয়া আছে,—চালাইতেছে, নাচাইতেছে, আবার মৃত্যুমুখে সবেগে নিক্ষেপ করিতেছে—তাহার যে একটা অন্য ধর্ম্ম বা ন্যায় (Logic) আছে, তাহার সন্ধান তাঁহারা

† In times of national cricis when causes are added in the Arithmatical rogression, the effects are abruptly multiplied in the G. P.

রাখেন না। একমাত্র বুদ্ধিচক্রের প্রণালী মধ্যে সারাজীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া, একমাত্র যৌক্তিক ন্যায়ের (Rational Logic) চর্চ্চায় দিনাতিপাত করিয়া জীবনের অন্যান্য যন্ত্রগুলিকে ও তাহাদের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলীকে (Sentimental Logic) তাঁহারা উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। উপেক্ষা করিলেও আমাদের এই পঙ্কিল প্রাণ, পাপমন ও অস্থির চিত্ত অন্তর্হিত হয় নাই। হইবারও নহে। পরন্তু তাহাদের অব্যর্থ প্রভাব সারা মানব-জীবন গঠন করিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞান-মন্দিরে যে বিচারময়ী বুদ্ধি পণ্ডিতগণকে অব্যর্থ পথ নির্দ্দেশ করেন, মন্দিরের বহির্ভাগে তাঁহার আর কোন উপাসনা হয় না। যে বুদ্ধি অদ্ভুত বিজ্ঞানের জন্ম দিয়াছে তাহা কিন্তু ইতিহাস সৃজন করে নাই। মানুষের চরিত্র, তার জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার, যুগ-যুগের প্রবণতা ও ধারণাই (faith) ঐ ভ্রমাত্মক ইতিহাস, যাহা আমাদের পাঠাগার সুশোভিত করে, তাহার সত্য ঘটনাগুলিকে জন্ম দিয়াছে। বিজ্ঞান-মন্দিরে বিবেক-দেবতার একাধিকার থাকিলেও মানব-জীবনে তাঁহার অধিকার বুঝি দূরবীক্ষণ সহায্যেও নির্ণয় করা যায় না। ফরাসী বিপ্লবের সময় আমরা বহু বার বিবেক স্পর্শ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, বহু বার বিচার ও স্বাধীন চিন্তার কথা বলিয়াছি, কিন্তু আমরা কর্ম্ম করিয়াছি সংস্কারবশে, নিভৃত প্রেরণার টানে। যখন আর আগাইতে হইবে না, যখন যুদ্ধার্থে বহির্গত হইবার সময় হয় নাই—হইলে প্রভূত অনর্থ—তখন, যখন সাধারণে উত্তেজনা-বশে ছুটিয়াছে রাজপথাভিমুখে, তখন আমরা বলিয়াছি—'যদি তাহারা সব গেল, ত আমি থাকিব কেন? আমিই তাহাদের আগাইয়া যাইব!' (Je suis leur chef, il fant bien que je les guide) যখন পৃথিবীর সত্য ইতিহাস লিখিত হইবে, যখন ঐতিহাসিকগণ, জ্ঞানশলাকা দ্বারা প্রাকৃতের ভিতরে যে অপ্রাকৃত ক্রীড়া করিতেছে, প্রাকৃতকে চিরিয়া উল্টাইয়া তাহা তোমাদিগের নয়ন গোচর করিতে পারিবে, তখনই তোমরা আমার সকল কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

সীমান্তরালে গিয়া লোকে দেখে এত কামান, এত বন্দুক, এত সঙ্গীন, এত অশ্ব, এত খাত—কিন্তু যদি মনুষ্যের দৃষ্টি একটু সূক্ষ্ম হয়, যদি একটু অন্তর দেখিবার তাহার ক্ষমতা থাকে, যদি কোন স্নায়বিক অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা 'রেটিনা'র বস্তুর ছাপ না ফেলিয়া কেবল তাহার পিছনে যাহা আছে তাহার ছায়া পড়ান যায় (এবং ইহা খুব অসম্ভবও নহে), তাহা হইলে মানুষ আর সৈন্য, কামান শোলা, বন্দুক কিছুই দেখিবে না—দেখিবে কেবল এক বিশাল ভাবসমুদ্রের উপর

বিভিন্ন ভাব-তরঙ্গ ভিন্ন বায়ুচালিত হইয়া আকাশে, অন্তরীক্ষে, পাতালে, ভূধরে, শিখরে, গহনে, কাননে অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে—আছড়াইয়া পড়িতেছে—চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে—পরস্পরকে দলিয়া মথিয়া গ্রাস করিতে প্রয়াসী। সে যুদ্ধের অবসান নাই—বিশ্রাম নাই—অবধি নাই। সে যুদ্ধের প্রকৃত ক্ষেত্র মানব সমষ্টির মানস প্রদেশে, চিদ্-সাগরের বক্ষে, প্রাণ-প্রবাহের উপরে। ইহাই যুদ্ধের অন্তর-চিত্র যাহা সংস্কার-প্রণোদিত ও সংস্কার-চালিত।

কিন্তু এই ভাবসমুদ্রের শতমুখী ঝটিকা যাহার আঘাতে এক জল শতধা বিখণ্ডিত হইয়া পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, পরস্পরকে গ্রাস করিতে প্রয়াসী হয়—ইহা কি? এইটী জাতীয় প্রেরণা, জাতীয় ভাব, জাতীয় বিশ্বাস, জাতীয় অন্তর-পুরুষের ইচ্ছা। প্রাণের আবেগ, চিত্তের সংস্কারজাল, মনের প্রকম্পন তাহার বহু নিম্নে, বহু ঊর্দ্ধে, গূঢ়, নিগূঢ়ে ইহার অবস্থিতি—কিন্তু কোথা হইতে তাহা আসে, আবার কোথায় চলিয়া যায়, কোথায় তাহার উৎস—ভক্তের নিকট তাহা প্রতিভাত হইলেও মনস্তত্ত্ববিদ্ তাহার সন্ধান আজও পায় নাই। বিজ্ঞান তাহাকে এখন দূরে ঠেলিয়াই রাখিয়াছে আমি তোমাদিগকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিব না। তবে আমার মনে হয়—এই ভাবপ্রবাহ, যাহা যুগধর্ম্মরূপে যুগে যুগে নব নব সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া, নব নব শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম দিয়াছে, কত মহারাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছে, মহারাষ্ট্রকে অতল জলে ডুবাইয়াছে, কত গ্রীস রোম ট্রয়, কার্থেজের জন্ম দিয়াছে, আবার নিমিষে তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছে,—সে ভাব, সে প্রেরণা, হয়ত যে দিন মানুষ হইয়াছিল, কিম্বা তারও পূর্ব্বে যখন প্রথম প্রাণবিন্দুটি বিন্দুমাত্র মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়া নড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইদিনই এই ভাব লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।—আদিম, সর্ব্বপ্রথম, গূঢ়তম্ সে ইচ্ছাটি যুগে যুগে, অভ্যাস, প্রবণতা, সংস্কার ভেদ করিয়া আপনার স্বরূপটি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছে, আবার স্বনির্ম্মিত মূর্ত্তিকে পছন্দ না হওয়ায় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া বিসর্জ্জন দিতেছে। আপনার আনন্দে আপনি নাচিতেছে, হাসিতেছে, আবার রোষে আপনাকে আপনি ভাঙ্গিতেছে, আপনার বুকে আপনি দর্পভরে পদখানি তুলিয়া দিতেছে। ইহার ইয়ত্তা কে করিবে? ইহা আছে, ইহার চিত্র যুগে যুগে মানুষ দেখিয়া আসিতেছে, কতদিন কত জনে ইহার বজ্রনির্ঘোষ শুনিয়াছে, কিন্তু কেহ ইহাকে ধরিতে পারে নাই, বুঝাইতে পারে নাই, আমার নিকটও তাহার আশা করিও না।

যখন জাতীয় উত্থান-পতন হয়, তখন এই জাতীয় অন্তর্জীবন লইয়া বিশেষ

ভাবে, প্রকট ভাবে ক্রীড়া চলিতে থাকে। তখন স্বতঃই সকলেরই দৃষ্টি পড়ে জাতির জাতীয়তার দিকে, সত্তার দিকে, স্বতন্ত্রতার দিকে। সকল জাতীয় অভ্যুত্থানই প্রথমে একটা জাতীয়তার সঙ্গ, একটা নিজত্বের অন্বেষণ (National self-consciousness) ভিন্ন আর কিছুই নয়। জাতীয় উন্নতি পথে সহায়ক হইতে হইলে জাতীয় নিজত্বের দিকে, অন্তরের দিকে যাহাতে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাহারই প্রচেষ্টা করা উচিত। বিজাতীয় ধর্ম্ম, সংস্কার বা অবরণ লইয়া জাতীয় অভ্যুত্থান অনন্তর কথা। কিন্তু যে জাতীর জাতীয়তা আছে, যাহার কিছু কিছু আত্মচৈতন্য আছে, তাহাকে জাতীয় জীবন সঙ্কটকালে অনায়াসে, ঐ তারে ঘা দিয়া আশার পথে—জয়ের পথে পরিচালিত করা যায়। কিন্তু যে জাতি, যে কোন কারণ বশতঃ আত্মচৈতন্য হারাইয়াছে, দাসত্বের শৃঙ্খলে যাহাদের নিজত্ব প্রায় লুপ্ত বা অন্ধকার তাহাদিগের কথা বড় জটিল। এরূপ জাতির প্রথমে যে কোন উপায়ে হ'ক একটা আত্মচৈতন্য জাগ্রৎ করা কর্ত্তব্য। পরে সেই অস্বচ্ছ, বদ্ধ জ্ঞানটিকে মাজিয়া ঘসিয়া সুন্দর ও শক্তিমন্ত করা যাইতে পারে। তোমাদের দেশে এখন আত্মচৈতন্যের বিলোপ ঘটিয়াছে। বৈদেশিক সভ্যতায় প্রতিহত হইয়া সামান্য আত্মজ্ঞান ফুটিলেও এখন জাতিটী—সে কি ছিল, তাহা একেবারেই জানে না। বৈদিক উদারতা ও সহজ সমাজ জীবন, অযোদ্ধার নৈতিক আড়ম্বর, হস্তিনাপুরের ক্ষাত্রবীর্য্য, শিল্পকলা ও বিলাস, মগধের ধর্ম্মাভিমানের কথা কয়জন হিন্দু জ্ঞাত আছে, কয়জনই বা তাহা অনুভব করিয়াছে? স্ত্রীলোকদিগের কথা না বলিলেই চলে। তোমাদের দেশের স্ত্রী ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষ সকলকে আমি এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলি। তাঁহাদের মধ্যে জাতীয় আত্মা একেবারেই নিদ্রিত। তাহাদিগের প্রথম আবশ্যক কিঞ্চিৎ শিক্ষা—যাহাতে কোনও রকমে তাহাদের একটা অহং জাগ্রত হয়। তারপর না হয় সেই আমিত্ববোধকে সাধনাসাহায্যে স্ফুটতর, শুদ্ধতর,উদারতর করিয়া লওয়া যাইবে। যদি একবার প্রাণ জাগে ত চিত্ত, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান সবই জাগিবে। যখন একটা জীবনের বোধ হয়,তখনই কেবল উচ্চজীবন-পথে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। (Vital will) প্রাণময় ইচ্ছা অগ্রে জাগরিত হউক ; তারপর আধ্যাত্ম-ইচ্ছা (spiritual will) আপনিই জাগিয়া উঠিবে। প্রাণের গতি আত্মাতেই নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাণ আত্মার স্থূলতর (প্রাণময়) স্বরূপ। এখানে জীবন নাই, উচ্চশিক্ষা এখানে ব্যর্থ, যোগ এখানে অবান্তর—আমিই নাই, ত কাহার সহিত কাহার যোগ হইবে।

উত্তেজনা-পথে প্রতিভাবান্ পুরুষগণ জাতীয় নিদ্রিত শক্তিপুঞ্জকে আয়ত্ত করিয়া দেশে অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারেন, কিন্তু তাহার রক্ষা জাতিকেই করিতে হইবে। জাতি যদি অজ্ঞান হয় ত তাহার উত্থান-পতনের মধ্যে সময় ব্যবধান খুব অল্পই থাকে। জাতীয় প্রেরণা, তাহার দর্শন, জাতীয় সংস্কারের পূর্ণ জাগরণ, ইহা লইয়াই জাতীয় ইচ্ছা গঠিত—তাহার অবর্ত্তমানে কোন সংস্কারই (reform) সম্ভব ও স্থায়ী নহে। মানুষকে সংস্কার করিতে হয় না—প্রাণ জাগিলে সে আপনার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজ রাজনীতি আপনিই বাছিয়া লয়। মানুষ অত্যদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সংস্কার (senti ments সৃষ্টি করিতে পারে না—প্রেরণাত দূরের কথা।

দেখ রেঞ্জীর ইতালী (Rienzi's Italy), নেপোলিয়নের মহাসাম্রাজ্য, রান্দার পঞ্জাব, শিবাজীর মহারাষ্ট্র, প্রতাপাদিত্যের বঙ্গদেশ। একজন মহাত্মা প্রতাপ কর্ম্মকৌশলে যুগব্যাপী কাল মধ্যে বাঙ্গলাদেশকে স্বাধীনতা-মুকুট পরাইয়া দিলেন ; আবার যুগ কাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার সহিত তাঁহার বঙ্গদেশও ডুবিল ; এমন ডুবিল যে আজ চারি শত বৎসরেও মাথা তুলিল না। বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন—মানুষ মানুষকে স্বাধীন করিতে পারে, পরাধীন করিতে পারে, কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্ একথা বিশ্বাস করিবেন কেমন করিয়া? শিবাজীর মহারাষ্ট্র—যদিও তাহার পিছনে ছিল রামদাসের শিষ্যমণ্ডলী, রামদাসের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, তবুও তাহা শত বৎসর টিকিল না—কারণ জাতীয় আত্মচৈতন্যের অভাব। বান্দা পঞ্চনদ অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে বিলীন হইল—এখানেও জাতীয় আত্মচৈতন্য সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া পড়ে নাই।

রেণজির ইতালী—এক নব-উপাসনাগমে ভোজবাজির মত রোম ফেণ্ডাল্ পাদুকা পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল—কত সুখ, কত স্বাধীনতা, কত উল্লাস! তারপর দ্বাদশচন্দ্র উদিত হইতে না হইতেই "ট্রাইবিউন" বিতাড়িত—বোসিয়েরা সানন্দে দাসত্ব শৃঙ্খলটি কণ্ঠে ধারণ করিল। তার পর "কেকো দেভেসিও"—অজ্ঞ জনসাধারণের চির-প্রতিনিধি, যে একদিন বুক চিরিয়া দেখাইয়াছিল—"এইখানে আমার লেখা আছে, রেন্‌জিও প্রজাতন্ত্র," সেই আবার উভয়ের নির্ব্বাসনে কত উদ্‌গ্রীব—আবার তারই ছুরিকাঘাতে রেন্‌জীর প্রাণ গেল। দোষ 'কেকোর' নয়—সর্ব্বদেশের অজ্ঞ প্রজাসাধারণই এইরূপ। অজ্ঞ লোক-সঙ্ঘ উত্তেজনার দাস, তাহাদের বিচারবুদ্ধি নাই—তাহারা সামঞ্জস্য জানে না—নয় প্রেম, নয় ঘৃণা, নয় ভক্তি, নয় হত্যা, ইহার মধ্যে আর তাহাদের

ই না ই। তাহারা যে একেবারে অন্ধ তাহা নহে। তাহাদেরও একটি চক্ষু আছে, অন্তরে. সেটা তাদের স্বতঃ-প্রেরণা (Instinct), । এই স্বতঃ-প্রেরণা বশেই তাহারা চলিয়া থাকে—তুমি আমি কৌশলে বিমুখ করিলেও, তার পর অল্পক্ষণ পরে তাহা জাগিয়া উঠে। প্রাণের আবেগ কে রোধ করিবে? তবে প্রাণটা জ্ঞানগোচর হওয়া চাই।

তার পর দেখ রোমের প্লেজ। স্বাধীনতার আলোক নিভিবার সঙ্গে সঙ্গে কি বীভৎস অন্ধকার—লোকে পাগল হইয়া শেষে 'জয় জয় প্লেজের জয় গাহিয়া বেড়াইতেছে।' তস্কর দলে দলে কারাগার ভাঙ্গিয়া বহির্গত, কে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিবে? স্ত্রীগণ এক প্রমীলার রাজ্য খুলিয়া বসিয়াছেন—কোথায় পুরুষ? কাহাকে লইয়া আজ শূন্য সিনটি পূর্ণ করিব? শেষে জবরদস্তি!—কনভেন্টে মদ্যপায়িগণ, দেবদাসী (sisters দিগকে লইয়া নৃত্যপরায়ণ—অট্টালিকা দস্যুর আবাসভূমি। স্ত্রীগণ উৎপীড়িত—সাধু পদদলিত—সারা দেশ পরিত্যক্ত। ছয় মাস পূর্ব্বে রেণজি যাহার "ক্যাপিটলে" দাঁড়াইয়া মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করাইয়াছিলেন! পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষকে বৃথা অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু যে জাতি বৃথা অজস্র যন্ত্রণা ভোগ করে, স্বীয় কপোলে করাঘাতই তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

একজন অরবিন্দ, একজন গান্ধী, একজন তিলক, একজন মহাত্মা রামকৃষ্ণ, একজন বিবেকানন্দ দেশকে মুক্ত করিতে, উন্নত করিতে পারেন না। জাতিই জাতিকে উন্নত করিবে। চাই বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠান—চাই বহু কারিগর। আমাদের দেশে বড় বড় পণ্ডিত আছেন। কিন্তু কে তাঁহাদের সত্যগুলিকে ফুটাইয়া বিরাট করিয়া তুলিয়া ধরিবে? বহু কারিগর নাই তাই আমরা বাণিজ্যে এত পশ্চাৎপদ। কিন্তু জাপান—কত মুষ্টিমেয় মহাপণ্ডিত তথায় বিরাজমান—কিন্তু কারিগর অসংখ্য—তাহারা আমাদের অনেক উর্দ্ধে। জাতি কতটা মুক্তি, কতটা সুখভোগ, কতটা উন্নতির উপযুক্ত হইয়াছে—এ প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিবিশেষ নহে, ইহার উত্তর দিবে বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠান—বিদায়!

শ্রীহারাধন বক্সী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

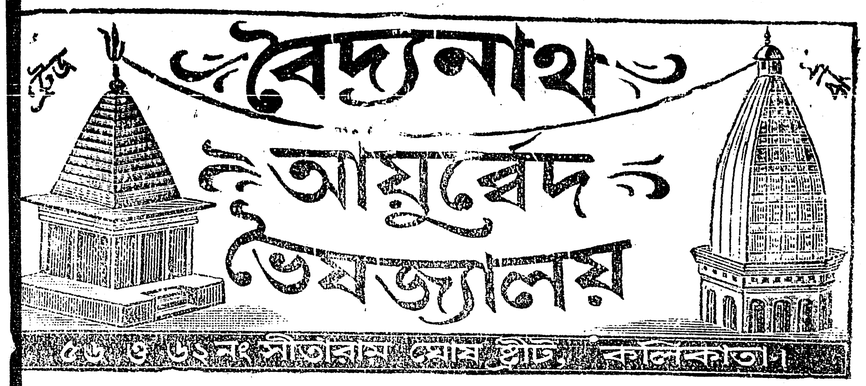

আমরা যে উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া যেরূপ উৎসাহ-উদ্যমের সহিত এই ভৈষজ্যালয় খুলিয়াছিলাম, বাঙ্গালার, শুধু বাঙ্গালার কেন? নিখিল ভারতের সুধীজন-সমাজ শুনিয়া সুখী হইবেন, শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথদেবের কৃপায় আমাদের সেই উদ্দেশ্য-উদ্যম এখন সফলতার পথেই অগ্রসর।

আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল—প্রতিপদে পরমুখাপেক্ষী ভারতসন্তানকে আবার ঘরের দিকে ফিরাইব,—বিদেশের মাকালের লোভ ছাড়াইয়া স্বদেশের রসালের স্বাদ লওয়াইব—খনির তিমিরগর্ভে কত যে অনন্ত রত্ন নিহিত আছে তাহা তাহাকে চিনাইব। যাহার উচ্ছিষ্টাংশ পাইয়া পৃথিবীর কত জাতি আজ ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য, ভারতের অতীত জ্ঞান-গবেষণার প্রোজ্জ্বল নিদর্শন—চিরপূত ঋষি-মনীষার অপূর্ব্ব ফল—সেই আয়ুর্ব্বেদভাণ্ডার তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট খুলিয়া দিব; সে তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিবে,—হারানিধি হাতে পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

আমাদের এ উদ্দেশ্য আজ সম্পূর্ণ না হউক, বহুলাংশে সিদ্ধ হইয়াছে যাহা চিরসত্য—চিরসুন্দর, তৎপ্রতি লোকে শ্রদ্ধাবুদ্ধি স্থাপন করিতেছেন, আসল নকল চিনিয়া লইতেছেন, কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ কিনিতে কেহই আর এখন চাহেন না। মহাত্মা গান্ধীর অমোঘ উদ্যম এ পক্ষে আমাদের আরও অনুকূল হইয়াছে।

আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, যত অর্থই ব্যয় হউক, যেরূপ পরিশ্রমেরই প্রয়োজন হউক, আয়ুর্ব্বেদ-বিহিত দুর্লভ ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, মোদক, তৈল,

৫৮ ও ৬২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অবলেহ, জারিত শোধিত ধাতু, মকরধ্বজ ও অন্যান্য যাবতায় ঔষধ—শাস্ত্রের বিধি-
নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করিয়া বিজ্ঞ বিচক্ষণ কবিরাজমণ্ডলীর সাহায্যে যথাযথ-
ভাবে প্রস্তুত করিব, আর যতদূরসম্ভব সুলভ মূল্যে সর্ব্বসাধারণকে বিলাইব।
লোক খাঁটি জিনিষের আদর করিবেন, উপকৃত হইবেন, আর শাস্ত্রীয় ঔষধাবলীর
প্রতি ক্রমেই গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িবেন।

আমাদের এ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের ভৈষজ্যালয়ের প্রস্তুত
শাস্ত্রসম্মত অকৃত্রিম ঔষধাদির গুণে মুগ্ধ হইয়া আজ ভারতের বিভিন্ন দেশবাসী
নরনারী আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই জন্যই বুঝি, আজ দরিদ্রের কুটীর আর
রজাধিরাজের প্রাসাদ—সর্ব্বত্রই আমাদের ভৈষজ্যালয়ের প্রশংসার এত গুরু-
গম্ভীর দুন্দুভিনাদ উত্থিত !!

আমরা ভাবিয়াছিলাম, আজ কাল বাজারে যেরূপ ভালোর নামে ভেজা
ও জালের রাজত্ব চলিয়াছে, অর্থোপার্জ্জন-সর্ব্বস্ব ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়া লোক
যেরূপ ঠকিয়াছেন ও ঠকিতেছেন, আয়ুর্ব্বেদের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঔষধের শুধু নাম-
মহিমাতেই বাজারে যেরূপ বাজে বেশাতী বিকাইতেছে, এবং সস্তার প্রলোভন
লোককে যেরূপ ভাল মন্দ বিচারে বিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে আমাদের
এই অকৃত্রিম কর্ম্মচেষ্টা ও প্রভূত অর্থব্যয় সবই বুঝি পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু
শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথদেবের কৃপায় অতীব আনন্দবার্ত্তা এই যে, আমাদের সাফল্য
সম্ভাবনায় এখন আর আশঙ্কার লেশ মাত্র নাই। যাহা খাঁটি, তাহা চিরদিনই
খাঁটি ; খাঁটির আদর করিতে এখনও লোকে ভুলে নাই। আমাদের মহোপকারী
অকৃত্রিম ঔষধগুলি তাই আজ জনসমাজে এত আদৃত।

সুতরাং আমরা আবার বলি, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, শ্রম, সকলই
এখন সার্থক হইয়াছে। জন সমাজ এই ভৈষজ্যালয়কে যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের
চক্ষে দেখিতেছেন, তাহাতে এ জন্য যে অজস্র অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহাও আজ
সার্থক, আর যে স্বর্গীয় জমিদার মহাশয় অকৃত্রিম শাস্ত্রীয় ঔষধাদি প্রস্তুত
করাইয়া লোকের প্রকৃত উপকার সাধনের জন্য এ ব্যাপারে অকাতরে
অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন, এত দিনে তাঁহারও সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে চলিল।

এই শুভাবসরে আমরা আবার দ্বিগুণ উদ্যমে কর্ম্মারম্ভ করিলাম। শ্রীশ্রীবৈদ্য
নাথ দেবেরকৃপা, আর ভারতেজা · য় বৈদ্যপীঠই আমাদের ভরসা। ইতি

মদনানন্দ মোদক

এই শাস্ত্রসিদ্ধ মহোপকারী মোদকের বিশেষ পরিচয় প্রদান বাহুল্য
মাত্র। এ মোদক কি মহাশক্তিধর—কিরূপ সর্ব্বরোগহর, সে সম্বন্ধে
শাস্ত্র কি বলিয়াছেন শুনুন,—

"মোদকং মদনানন্দং সর্ব্বরোগে মহৌষধম্।
কথিতং দেবদেবেন রাবণস্য হিতার্থিনা ॥"

আমরা সকলকেই একবার আমাদের প্রস্তুত এই বিশুদ্ধ মদনানন্দের
গুণ পরীক্ষা করিতে বলি। মূল্য প্রতি সের ১৬৲ টাকা ১৪ মাত্রা ১৲ টাকা
ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

দশমূলারিষ্ট।

(রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধের রাজা।)

যজ্জরা-ব্যাধি বিধ্বংসি, বীর্য্যস্তম্ভকরং পরম্।
দীপনং, বৃংহণং, বৃষ্যং, ।ভেষজস্তদ্রসায়নম্ ॥

যে ঔষধ সেবনে জরা (বার্দ্ধক্য) ও সকল প্রকার ব্যাধির আক্রমণ হইতে শরীরকে
অব্যাহত রাখিতে পারা যায়, যে ঔষধ সেবনে শরীরের প্রধান শুক্রধাতু উপচিত ও অবি-
কৃত অবস্থায় শরীরে অবস্থান করে এবং যে ঔষধের অনুশীলন প্রভাবে জঠরাগ্নির উদ্দীপন,
শরীরের পুষ্টি, ও রতি সামর্থ্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তাহা রসায়ন ঔষধ বলিয়া উক্ত। এই
রসায়ন ঔষধের স্বাভাবিক বিশিষ্টগুণ এই যে, ইহা ব্যাধির অবস্থায় ব্যবহৃত হইলে ব্যাধি
প্রশমক এবং সুস্থাবস্থায় ব্যবহৃত হইলে ভাবি ব্যাধিনিবারক হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য,
উক্ত দশমূলারিষ্টে একাধারে এই গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্ত্ত্যভূমের অমৃতকল্প, সমূহ-
গুণ সম্পন্ন, এই ঔষধ যথা নিয়মে সেবিত হইলে, ধাতুক্ষয় ও প্রমেহ, শ্বাস ও কাশ, বাতব্যাধি
ও যক্ষ্মা, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি, গ্রহণী ও শূল, অর্শ ও কুষ্ঠ, উদর ও ভগন্দর, অশ্মরী ও মূত্র-
কৃচ্ছ, পাণ্ডু ও কামলা, প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি নিঃশেষ প্রশমিত হইয়া থাকে, এই ঔষধ
দেহ ক্ষয়কারী প্রবল যক্ষ্মারোগে প্রযুক্ত হইলে রোগীকে সহসা দুর্ব্বল হইতে দেয় না। এবং
কৃশতারোগে ইহার পুষ্টিকারিতা শক্তি স্বতঃসিদ্ধ। স্ত্রীলোকের জরায়ুদুষ্ট নিবন্ধন বন্ধ্যা-
রোগে প্রযুক্ত হইলে, ইহা সন্তানপ্রদ হইয়া থাকে।

—চারি আঃ শিশি ১৲ টাকা, আট আঃ শিশি ৲ টাকা, ২৪ আঃ বোতল ৬ টাকা।

মকরধ্বজ

মকরধ্বজ—অনাদিকালসিদ্ধ বিশ্ববিখ্যাত মহৌষধ। ইহা মানবমঙ্গলেচ্ছু ঋষিগণের যোগপূত সূক্ষ্ম বুদ্ধির এক চমৎকার আবিষ্কার! জগতের কোন চিকিৎসাশাস্ত্র অদ্যাবধি এরূপ সর্ব্বরোগহর শক্তিমান্ ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মকরধ্বজ নিজগুণেই আজ ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ে উদ্যত! বড় বড় বিদেশী বিলাতী ভিন্নধর্ম্মী চিকিৎসক কর্ত্তৃকও ইহা এখন শতমুখে প্রশংসিত। যাঁহারা বিদেশের হাঁচিটী কাসিটী পর্য্যন্তও ভালবাসেন, তাঁহারও আজ মকরধ্বজের গুণমুগ্ধ।

মকরধ্বজ অতি সূক্ষ্মমাত্রায় দেহে প্রবেশ করিয়া সামান্য সর্দ্দি কাসি হইতে অতি গুতরুর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত সত্বর আরোগ্য করিয়া দেয়। বিশেষ বিশেষ অনুপানযোগে সদ্যোজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া জরা-জর্জ্জরিত অশীতিপর বৃদ্ধকেও ইহানির্ভয়ে সেবন করান যায়। ইহা নিয়মিত সেবনে মেধা, স্মৃতি, কান্তি ও পুরুষত্ব বৃদ্ধি হয়। ক্ষীণধাতু ও ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তির পক্ষে ইহা সুধার ন্যায় কার্য্যকর হইয়া থাকে।

আমাদের কথা।

মকরধ্বজ আজ যত্র তত্র বিকাইতেছে! সে সব মকরধ্বজের উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা অবশ্যই দায়িত্ব লইতে পারি না এবং ইহা প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি যেরূপ আয়াস-সাধ্য, তাহাতে ইহা সস্তায় দিতেও আমরা অক্ষম। কারণ প্রত্যেক পাকে বিশুদ্ধ ভাবে মকরধ্বজ তৈয়ার করিতে হইলে এক ভরি করিয়া উৎকৃষ্ট চিনাপাত সোণা দিতে হয়, ঐ সোণার মূল্য আজকাল ৩০।০ আনা। এক পাকে মকরধ্বজ কেবলমাত্র ৬৷৷০ হইতে ৭ ভরি পাওয়া যায়। সোণা যদিও কতক পাওয়া যায় কিন্তু সে সোণা তেমন কাজে লাগে না। সুতরাং ৪৲ টাকায় কিরূপ মকরধ্বজ পাওয়া যাইবে তাহা সুধীজনই বিবেচনা করিবেন। অথচ যতদূর সম্ভব সুলভ-মূল্যেই ইহা আমরা বিক্রয় করিতেছি। আমাদের মকরধ্বজ ব্যবহার করিলে বুদ্ধিমান্ মাত্রেই ইহার মহার্ঘতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মূল্যাদি—প্রতিভরি ১২৲ টাকা, সাত মাত্রা—একটাকা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

৫৬ ও ৬২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অমৃতারিষ্ট।

[সকল প্রকার পুরাতন জ্বরের অমোঘ ঔষধ]

ইহা সেবনে তৃতীয়ক, চতুর্থক বা দ্বৌকালীন প্রভৃতি বিষম জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ দুষ্টিজনিত সমস্ত জীর্ণজ্বর, রক্তদুষ্টি, প্রমেহ ও ক্ষয়জ্বর অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রশমিত হয়।

যাহাদের জ্বর স্পষ্ট প্রকাশ পায় না, অথচ প্রত্যহ বৈকালে বা যে কোন কালে গা ম্যাজ-ম্যাজ করে, হাত, পা, চোখ জ্বালা করে, মাথা দপ্ দপ্ করে, ভার ভার বোধ হয় ও দেহের দুর্ব্বলতা অনুভব হইতে থাকে, তাহাদের পক্ষে ইহা সদ্য ফলপ্রদ।

আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ম্যালেরিয়াই বলুন, কালাজ্বরই বলুন, আর আধুনিক নামের যে কোন জ্বরই বলুন, এই অমৃতারিষ্ট সর্ব্ব জ্বরেরই ব্রহ্মাস্ত্র।

মূল্য—৮ আউন্স একশিশি ৸০ আনা, ২৪ আঃ এক বোতল ২৲ ডাক মাশুল প্যাকিং স্বতন্ত্র।

আমলকি রসায়ন।

অম্লরোগের অব্যর্থ ঔষধ

অম্ল উদ্গার, অজীর্ণ, অম্লশূল, বুকজ্বালা, পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা, টোঁয়া ঢেকুর, মুখে জল ওঠা প্রভৃতি অম্লজনিত যাবতীয় উপদ্রব নিবারক। অম্ল জন্য যে কোনরূপ কষ্টের সময় ইহার একমাত্রা সেবনে মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করে। অগ্নি বল বৃদ্ধি করিয়া দুষ্পাচ্য দ্রব্য জীর্ণ করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

মূল্য একশিশি ॥৵০ দশ আনা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

বৈদ্যনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভৈষজ্যালয়।

৫৬ ও ৬২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈদ্যনাথ আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্ব্বেদ-বিহিত শ্রেষ্ঠ রসায়ন। ভারতের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান কে না আজ চ্যবনপ্রাশের গুণ জানিয়াছেন? শাস্ত্রে কথিত আছে—অতিবৃদ্ধ চ্যবন ঋষি স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগলের প্রদত্ত এই শ্রেষ্ঠ রসায়ন সেবন করিয়া নবযৌবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

চ্যবনপ্রাশ ব্যবহারে কাস, শ্বাস, ক্ষয়কাস, স্বরভঙ্গ, মূত্র ও শুক্রগত নানা দোষ সমূলে বিনষ্ট হয়। বলিতে কি মানুষের দেহটী যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়া তাহাকে নূতন মানুষ করিয়া তোলে। ইহাতে পুরুষত্ববৃদ্ধি, লাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যবহারে জরাজীর্ণ বৃদ্ধকেও যৌবনোচিত শক্তি-সামর্থ্য ও স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে দেখা গিয়া থাকে। এ রসায়ন মানবদেহে বাস্তবিকই মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে।

দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর মূল্যবান্ ঔষধ আজকাল সস্তায়—অতি সস্তায়—মহাসস্তায় অনেকে বিলাইতেছেন: কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি যে, খাঁটি বস্তু প্রস্তুত করিতে হইলে এ সকল ঔষধ কখন সস্তায় দেওয়া যায় না। ধরুন—কোন কোন শাস্ত্রীয় ঔষধে বংশলোচন ও অগুরুর প্রয়োজন। কিন্তু বাজারে ৫৲ টাকা সেরের বংশলোচন ও ৪০৲ টাকা মণের অগুরু, পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় নিদর্শন দেখিয়া মিলাইয়া লইতে হইলে ২০৲ টাকার সেরের কম বংশলোচন হয় না, আর ৪০৲ টাকা মনের স্থলে ৪০৲ টাকা সেরের কম অগুরু হয় না। অথচ এই দুইটী জিনিষই আবশ্যক। এই দুইটীর কথা মাত্র বলিলাম; এরূপ আরও অনেক মূল্যবান্ জিনিষের প্রয়োজন হয়। এক্ষণে বিজ্ঞ জন বুঝিয়া দেখুন—এ জাতীয় ঔষধ কিরূপে সস্তায় দেওয়া যায়? আর সস্তায় দিতে হইলে আসল কিরূপ নকল হইয়া পড়ে?

অতএব আসল জিনিষ দিতে গিয়া আমরা সস্তায় দিতে অক্ষম। তথাচ সুলভ মূল্যেই ইহার নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং বুদ্ধিমান্ লোক ইহাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেছেন।

মূল্যাদি—চ্যবনপ্রাশ প্রতিসের ৮৲ টাকা, ১৪ মাত্রা ১৲ ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং খরচাদি স্বতন্ত্র।

৫৬ ও ৬২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈদ্যনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভৈষজ্যালয়।

চন্দনাসব।

ঔপসর্গিক (গণোরিয়া) মেহ ও শুক্রমেহের অমোঘ ঔষধ

এই আসব বড়ই মনোরম! ইহা সেবনেও যেমন তৃপ্তি, ব্যাধি নাশেও ইহার তেমনই অপূর্ব্ব শক্তি!

মেহজনিত প্রস্রাবকালে ক্লেশপ্রদ যাতনাই যত দূর উপস্থিত হউক, ইহার এক মাত্রা কি দুই মাত্রা সেবনের পর হইতেই সর্ব্ব যাতনার অবসান হইতে থাকে। নিয়ম মত কিছু দিন ধরিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে দূষিত প্রমেহজনিত প্রস্রাব কালের অসহ্য জ্বালা, পূয প্রস্রাব, ক্ষীণধারে প্রস্রাব, রুক্ষ প্রস্রাব, প্রস্রাব না হওয়ায় জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তর ক্ষত বা শুক্রবন্ধ প্রভৃতি সমস্ত উপদ্রব অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রশমিত হইয়া যায়।

মূল্য,—৮ আঃ শিশি ১৲ টাকা, ২৪ আঃ বোতল ॥০ দুই টাকা আট আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

বৃহৎ মরিচাদি তৈল

কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পামা, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু, কণ্ডু, সর্ব্বাঙ্গে বা কোন অঙ্গবিশেষে সময়ে সময়ে চুলকণা, ক্ষত বা কোনরূপ চর্ম্মরোগ জন্মিলে এই তৈল ব্যবহার বিশেষ হিতকর। মূল্যাদি—প্রতিসের ১৬৲ টাকা।

বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল

বেদনাযুক্ত বাতরোগে এই তৈল মহৌষধ। মূল্য প্রতি সের ১৬৲

বিষ্ণু তৈল

বাতব্যাধি অধিকারে ইহা এক উৎকৃষ্ট তৈল।

হৃদয়, মস্তিষ্ক ও অন্যস্থানগত বায়ু প্রশমনে, উন্মাদে, অপস্মারে, হিষ্টিরিয়ায়, চিত্তবিকারে ও স্নায়ুবিকারে বিষ্ণুতৈলই মহৌষধ।

মূল্যাদি প্রতি সের ১২৲ টাকা।

বসন্ত কুসুমাকর

রসায়ন ও বাজীকরণ অধিকারে অদ্বিতীয় মহৌষধ।

ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য ও ক্লৈব্যরোগের মহোপকারী। উত্তেজনা শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহার ক্ষমতা চমৎকার। মূল্য—সাতবটী ৪৲ টাকা।

৫৬ ও ৬২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হরি রসায়ন

ইহা কি জানেন? যে রোগে আজ সোণার বাঙ্গালা শ্মশান হইতে বসিয়াছে, সেই ভীষণ জ্বররোগের ইহা অমোঘ ঔষধ।

কুনাইন!—কুনাইন!—কুনাইন!—দেশটা যেন কুইনাইনে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে। কুনাইনের জল—কুনাইনের বটী খাইয়া খাইয়া লোকে জ্বর ছাড়ায় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহারা যে উহাতে অন্তঃসারশূন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সে চিন্তা একবারও করে না।

যাহা হউক, জ্বর সহজে নির্ম্মূল হইয়া যায়, অথচ ভবিষ্যতে মানবদেহের কোনরূপ অপকার না ঘটে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা বড় বড় চিকিৎসক মণ্ডলীর সাহায্যে শাস্ত্রসাগর মথিত করিয়া এই রসায়ন আবিষ্কার করিয়াছি। ইহাতে কুনাইন নাই বটে, কিন্তু কুনাইন হইতেও উপকারী বস্তুপরম্পরার সমাবেশ আছে; সাধারণ ঔষধে রোগ মাত্রই সারে, কিন্তু এই রসায়নে রোগ তো সারিবেই; অধিকন্তু কিছুদিন ব্যবহারে ইহাতে সালসার কাজও করিবে।

হরি রসায়ন সেবনে প্রধানতঃ এই কয় প্রকার জ্বর আশু প্রশমন হয়—(১) তৃতীয়ক, চতুর্থক ও দ্বৈকালীন প্রভৃতি বিষমজ্বর (২) প্লীহাদুষ্টি ও যকৃৎদুষ্টি-জনিত জ্বর (৩) সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বর, (৪) রক্তদুষ্টি প্রমেহ ও ক্ষয় জন্য জ্বর। ম্যালিরিয়া জ্বর, কালাজ্বর প্রভৃতি আধুনিক নানানামে প্রচলিত ভীষণ জ্বরে যাঁহারা অন্যান্য ঔষধ সেবন করিয়া হতাশ হইয়াছেন, আমরা খুব জোর করিয়াই বলিতে পারি—তাঁহারা এই শাস্ত্রপূত ঔষধ সেবন করুন, হাতে হাতেই শুভফল লাভ করিবেন।

যাঁহাদের দেহে স্পষ্ট জ্বর প্রকাশ নাই, অথচ বৈকালে, বা অন্য কোন সময়ে গা ম্যাজ ম্যাজ করে, হাত পা চোক জ্বালা করে, মাথা দপদপ করে শরীরে ভার ভার বোধ ও দৌর্ব্বল্য অনুভব হয়, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা ধন্বন্তরি কল্প।

মূল্যাদি ৮ আউন্স শিশি, ১৲ এক বোতল ২৲ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

ম্যানেজার,
বৈদ্যনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভৈষজ্যালয়,
৫৬ ও ৬২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।